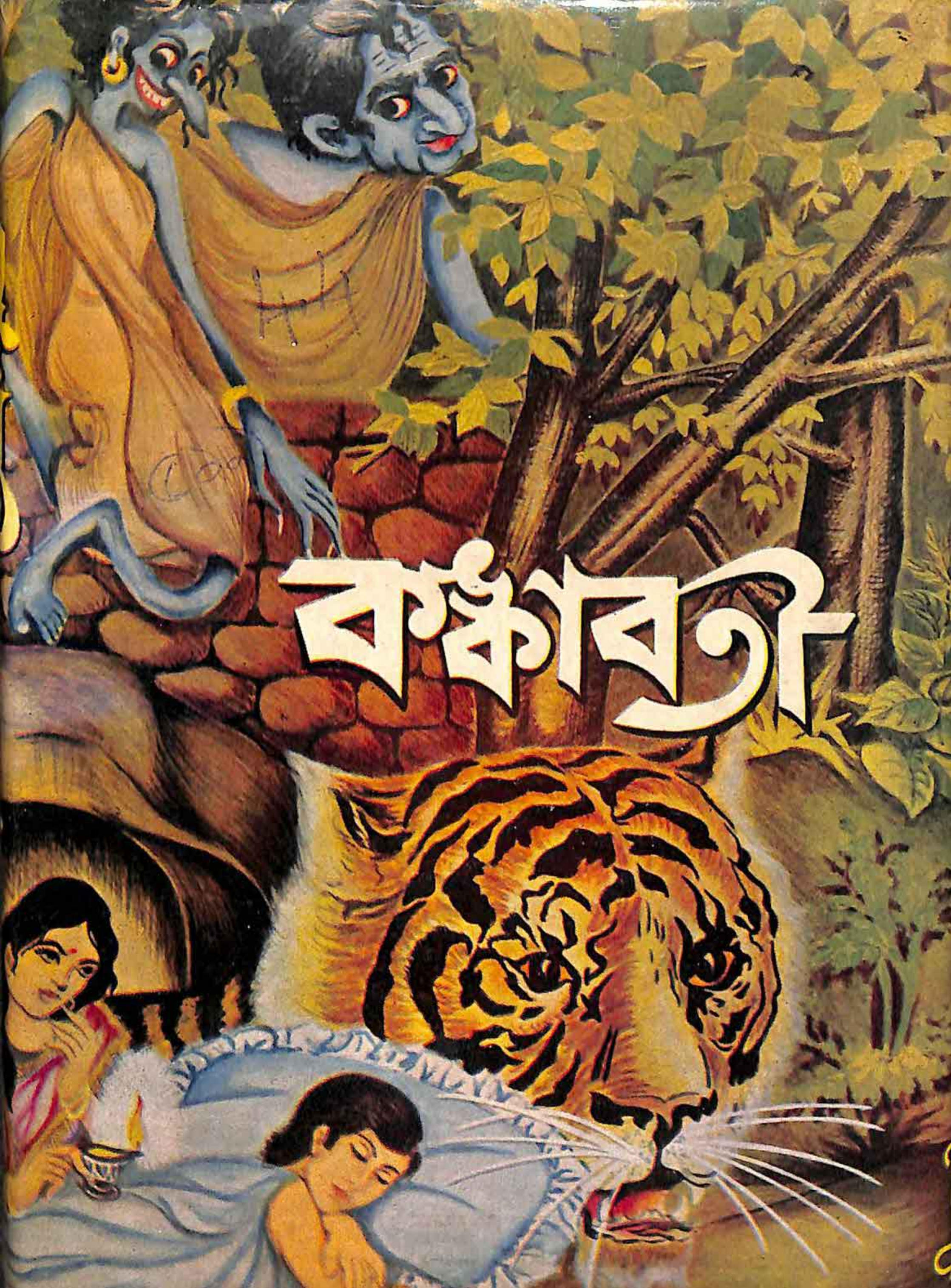

কঙ্কাবতী

কঙ্কাবতী

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কঙ্কাবতী

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

লীলা মজুমদার

রে অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস্ (পাবলিশিং)
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৮৬

প্রকাশক :
পি. রায়
রে অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস্ (পাবলিশিং)-এর পক্ষে
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫, অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
স্বপন রায়চৌধুরী

মুখ্য পরিবেশক :
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : ১০·০০

ভূমিকা

হয়তো দেড়শো বছর আগেকার বাংলার গেঁয়ো গল্প। পুরনো লোক-কথার কাঠামোতে মনের মিশেল দিয়ে তৈরি, মাটির গন্ধ মাখা, সাধারণ লোকদের সুখ-দুঃখ দিয়ে গড়া এই অসাধারণ রূপকথার রচয়িতা হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯)।

সেকালের গুরুজনরা বলতেন, 'নাটক দেখলে, নবেল পড়লে ছেলেমেয়ে বখে যায়।' সুন্দর একটি ভালোবাসার গল্প নিয়ে এ বই লেখা হয়েছিল। এর প্রধান উপজীব্য হল সরসতা আর সমবেদনা।

এই বইয়ের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না।……শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া উপদেশ দিই।' এই গল্প সেই নিয়মের ব্যতিক্রম বলে কবি কম খুশি হন নি।

সেই সময়টি ছিল আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম পর্ব। তার আগে পর্যন্ত কিশোর পাঠ্য বই কম ছিল ; বেশির ভাগ বই-ই ছিল খুব ছোটদের জন্য। যে বয়সের ছেলেমেয়েরা একটু বুঝতে একটু ভাবতে শিখেছে, এ বই তাদের জন্য।

এর রচনাকালে দেশ পরাধীন ছিল। বাংলা শিশুসাহিত্যের নিজস্ব একটা রূপ সবেমাত্র গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। অনতিবিলম্বেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার আর উপেন্দ্রকিশোর একটা বলিষ্ঠ নবযুগের সূচনা করেছিলেন। এ বইও তারি ইঙ্গিত দিচ্ছে।

১৯৫৬ সালে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণের উপর নির্ভর করে, কাহিনী অপরিবর্তিত রেখে, এই সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত পাঠ্যাংশ প্রকাশিত হল। যাদের জন্য এই বই পরিকল্পিত, তারা খুশি হলেই আমরাও কৃতার্থ হব।

লীলা মজুমদার

॥ ১ ॥

এ দেশে তখন ইংরেজদের রাজত্ব হলেও, গ্রামের লোকরা পাঁচশো বছর আগেও যেমন, তখনো প্রায় তেমনি ছিল। কুসুমঘাটি বলে একটা ছোট গ্রামে রামতনু রায় বলে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিজেও যেমন জপতপ, পুজোপার্বণ, মানামানি করতেন, যারা সে সব করত না, তাদেরো তেমনি নিন্দা করতেন।

তাই বলে যে বিষয়বুদ্ধি ছিল না, তা নয়। ওরা ছিলেন বংশজ ব্রাহ্মণ। তাদের বিয়ের সময় মেয়ের বাপ পণের টাকা দিত না, উল্টে টাকা পেত। বর যত বুড়ো আর বড়লোক হত, মেয়ের বাপ টাকাও পেত তত বেশি। রামতনু রায়কে সকলে ডাকত তনু রায়। তাঁর তিন মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়ে দুটির থুথ্‌ুরে বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তনু রায় অনেক টাকা পেয়েছিলেন। মেয়ে দুটি অবিশ্যি বছর না ঘুরতেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিল, তবু তাঁর শিক্ষা হয়নি। ছোট মেয়েটির মোটে এক বছর বয়স ; সময় হলে তাকেও বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। ছেলেটা একটা লক্ষ্মীছাড়া। লেখাপড়া, কাজকর্ম কিছুই করে না, অথচ টাকা পয়সার উপর যথেষ্ট লোভ।

তনু রায়ের স্ত্রীর কেঁদে কেঁদে দিন কাটে। সে কালের যেমন নিয়ম, একাদশীর দিন বড় মেয়ে দুটি জল পর্যন্ত মুখে দেয় না। তাদের দেখে মায়ের বুক ফেটে যায়। দেবতার কাছে রোজ প্রার্থনা করেন, ছোট মেয়ের যেন মনের মতো বর হয়।

পাড়ায় খেতুর মা বলে একজন গরীব ব্রাহ্মণী থাকতেন। তাঁর স্বামী শিবচন্দ্র লেখাপড়া শিখে কলকাতায় কাজ করতেন। তখন তাঁদের অবস্থা ভালো ছিল। অনেক গরীব দুঃখী ছেলেকে বাড়িতে রেখে তিনি মানুষ করেছিলেন। নিজের একটিমাত্র ছেলে, তার নাম ক্ষেত্র, সবাই ডাকত খেতু। তা খেতুর যখন চার বছর বয়স, তখন ওর বাবা মারা গেলেন। কিছুই রেখে যেতে পারেননি তিনি, রোজগারের টাকা দু হাতে বিলিয়ে দিতেন। এমন কি শ্রাদ্ধের খরচটুকু পর্যন্ত যোগানো দায় হল।

রামহরি মুখোপাধ্যায় ওঁদেরি দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শিবচন্দ্রই তাঁকে মানুষ করে কলকাতায় একটা চাকরিও করে দিয়েছিলেন। পরিবার নিয়ে তিনিও কলকাতাতেই থাকতেন। এই বিপদের সময় রামহরি এসে পাশে দাঁড়ালেন। শ্রাদ্ধের খরচের জন্য নিজে যা পারেন দিলেন, বাকিটা চাঁদা করে তুললেন। শ্রাদ্ধের পর খেতুকে নিয়ে তার মা দেশের বাড়িতে চলে এলেন। রামহরি চালের খরচটা পাঠাতেন, বাকিটা খেতুর মা পৈতের সুতো কেটে রোজগার করতেন। অতি কষ্টে তাঁদের সংসার চলত।

খেতুর যখন সাত বছর বয়স, রামহরি তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে, স্কুলে ভরতি করে দিলেন। ছাড়াছাড়ি হওয়াতে ছেলেরো যেমন কষ্ট, মায়েরো তেমনি। কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে তো ছেলে মানুষ হবে না, তাই তাকে যেতেই হল। সেখানে গিয়ে গোড়া থেকেই সে মন দিয়ে পড়াশুনো করত আর সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। ছুটিছাটাতে বাড়ি আসত। মায়ের মুখে তখন হাসি ফুটত। লোকে খেতুর ভারি সুখ্যাতি করত।

*　　*　　*

॥ ২ ॥

এ দিকে গ্রামের জীবন যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগল। ঐ গ্রামে কয়েকজন বুদ্ধিমান ভালো লোকও ছিলেন। নিরঞ্জন কবিরত্ন তাঁদের একজন। তাঁর অবস্থা ভালো, পণ্ডিত মানুষ, ভারি দয়ালু আর পরোপকারী। অনেক গরীব লোককে তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। সকলে তাঁকে ভালোবাসত। কিন্তু গ্রামের জমিদার জনার্দন চৌধুরী তাঁকে পছন্দ করতেন না। তিনি তো আর জমিদারের খোশামুদি করতেন না ; তাঁর কাছে কিছু আশাও করতেন না। নিজের পৈত্রিক যে জমিজমা ছিল, তাতেই তাঁর চলে যেত।

যাদের টাকাকড়ি ছাড়া অন্য গুণ থাকে না, তারা এ-সব গুণী লোকদের মনে মনে হিংসা করে বলে, তাদের দেখতে পারে না। নিরঞ্জনকে জনার্দন জমিজমার মাপ নিয়ে মিছিমিছি অপমান করার পর, নিরঞ্জন সকলের সামনে তাঁর দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেলে, জমিদারকে বলেছিলেন তিনিই সবটা নিতে পারেন। ব্যাপার দেখে জমিদারের মনে রাগ আর ভয় দুই-ই হয়েছিল। নিরঞ্জনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও, গ্রামের লোকের কাছে তাঁর সম্মান যথেষ্ট বেড়েছিল।

তবে এ সব ব্যাপার নিয়ে খেতুর মায়ের কি ? ছেলে চলে গেলে তিনি মাটিতে শুয়ে কাঁদছিলেন, এমন সময় তনু রায়ের স্ত্রী এসে হাত ধরে তাঁকে তুলে, চোখের জল মুছিয়ে, মিষ্টি ভাষায় অনেক

সান্ত্বনা দিলেন। নিজের হাতে তাঁর ঘরদোর পরিষ্কার করে, রাধাবাড়ার জোগাড় করে দিয়ে, বারবার বলে গেলেন যেন তিনি খাওয়া দাওয়া করেন, নইলে ছেলের অমঙ্গল হবে।

সে দিন বিকেলে এক বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে তনু রায়ের স্ত্রী আবার খেতুর মায়ের কাছে গেলেন। ছোট মেয়েটি বড় সুন্দরী; যেমন রং, তেমনি মিষ্টি মুখ আর কালো কোঁকড়া চুল। বাড়িময় সে হামা দিয়ে বেড়ায়, মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। মেয়ের আসল নাম কণকাবতী; গাঁয়ের লোকে ডাকে কঙ্কাবতী। তার মায়ের বড় ভয় একেও না তনু রায় টাকার লোভে বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন!

ক্রমে এই দুটি দুঃখিনী মায়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হল। ছুটি হলেই খেতুও বাড়ি আসত; কঙ্কাবতীর কাণ্ড দেখে তার ভারি মজা



লাগত। প্রায়ই তার জন্য কলকাতা থেকে একটা রঙীন খেলনা, কি পুতুল নিয়ে আসত। কঙ্কাবতীও তার ভারি ন্যাওটা হয়ে

পড়েছিল। মেয়েটাকে খেতুর মায়ের কাছে রেখে তনু রায়ের স্ত্রী তাঁর সংসারের কাজকর্ম করতেন।

বারো বছর বয়সেই খেতু একটি ছোট ছেলেকে পড়িয়ে যা পেত, তাই দিয়ে ওর মায়ের চালের খরচটা চলে যেত, উপরন্তু কিছু বাঁচত। সেবার খেতু দেশে যাবার সময় মায়ের জন্য একটা নামাবলী আর কঙ্কাবতীর জন্য ছোট্ট একটা লাল শাড়ি নিয়ে গেল। কঙ্কাবতী কি খুশি। তার পরের বার যখন তনু রায়ের মত নিয়ে একটা বর্ণ-পরিচয় নিয়ে এসে খেতু কঙ্কাবতীকে পড়াতে বসল, তখন মেয়ে ততটা খুশি হতে পারল না। কিন্তু খেতু তাকে প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে তবে ছাড়ল। তারপর সে নিজেই সব পড়তে পারত। সঙ্গে সঙ্গে খেতুর কাছে হিসাব কষাও শিখে নিয়েছিল। এত সব শিখতে তাকে মাঝে মাঝে বকুনিও খেতে হত। অবিশ্যি তার মেনিবেড়াল সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকত। নিজে যা শিখত, তার সবটাই তাকেও শেখাবার চেষ্টা করা হত। ক্রমে কঙ্কাবতীর পড়ার শখ চেপে গেল। কলকাতা থেকে খেতু তার জন্য বই আর পত্রিকা পাঠিয়ে দিত। রামহরির মেয়ে সীতাও আজকাল খেতুর মায়ের কাছে থেকে তাঁর দেখাশুনা করত। কঙ্কাবতীর সঙ্গে তার বড় ভাব।

* * *



॥ ৩ ॥

দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল। খেতুও ইংরিজিতে পর পর তিনটি পাস্ দিল। তিনবারই জলপানি পেল। তার মায়ের জন্য ঝি রেখে দিল এবং যখন যা দরকার সব অভাব মিটিয়ে দিত। বাস্তবিক খেতুর মতো ছেলে হয় না। সেকালে সকলেরি কম বয়সেই বিয়ে হত। তাই খেতুর মতো গুণী ছেলেকে জামাই করবার জন্য অনেক বড়লোকের বাড়ি থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসত। রামহরি সবাইকে ঠেকিয়ে রাখতেন। বলতেন ছেলের আরেকটু বয়স হক, পড়াশুনো শেষ করুক। তারপর ওর মা যা বলেন তাই হবে।

খেতুর সঙ্গেই কঙ্কাবতীর বিয়ে হবে, দুই মায়েরি মনে এই বড় সাধ। এমন কি কঙ্কাবতীর লোভী বাবাও বললেন, 'খেতুর সব-ই ভালো, খালি বাপ কিছু ধন-সম্পত্তি রেখে যায় নি। মেয়ে দিয়ে আমি কিছু পাব না। তবে ও নিশ্চয় ভালো রোজগার করবে। তখন না হয় আমাকে কিছু কিছু দেবে। ওর চেয়ে ভালো ছেলে না পেলে, ওর সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া যাবে। তাড়া তো নেই।'

এর পর আরো তিন বছর কেটে গেল; খেতুর কুড়ি বছর বয়স হল। অনেকগুলো পরীক্ষাতে পাস্ করে, তার একটা ভালো কাজেরো সম্ভাবনা হল। এমন সময় জমিদার জনার্দন চৌধুরীর বুড়ি স্ত্রী মারা গেলেন। বুড়োর বয়স আশী; ঘর ভরা ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি। তবু তাঁর শখের শেষ নেই। যেমনি তাঁর সাজ-সজ্জার

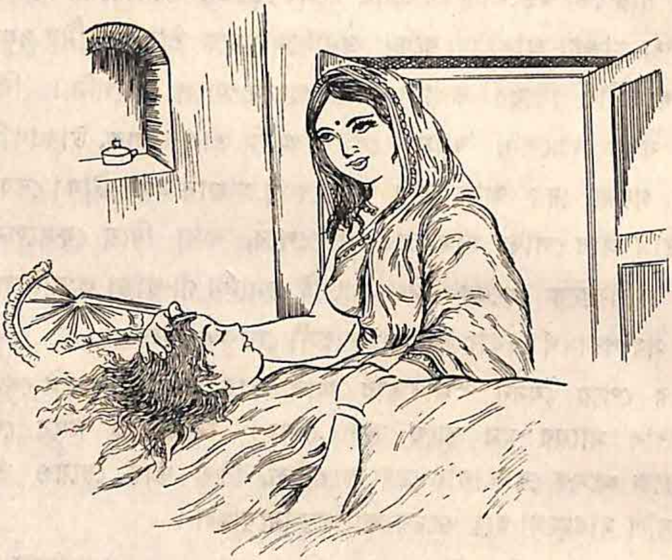
ঘটা, তেমনি তাঁর আরেকটি বিয়ে করার শখ। বিয়েই যদি করতে হয়, তাহলে ধারে কাছে কঙ্কাবতীর মতো সুন্দরী আর লক্ষ্মী মেয়ে কোথায় পাবেন? খোশামুদে মোসায়েবরাও নেচে উঠল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে খুব ভালো হবে।' মোসায়েবদের পাণ্ডা হলেন গোবিন্দ শিরোমণি। মাথাটি তাঁর প্যাঁচে ভরতি।

তনু রায় তো বড়লোক দেখলেই গলে পড়তেন। জনার্দনের বাড়িতে তাঁর নিত্য যাওয়া-আসা। বুড়ো জনার্দনের সঙ্গে তাঁর নাতনির বয়সী কচি কঙ্কাবতীর বিয়ের কথাটা তাঁর প্রথমে ভালো লাগেনি। কিন্তু জনার্দন যখন বললেন, 'আমার বৌকে আমি তালুকমুলুক, টাকাকড়ি, গা-ভরা গয়না দেব আর তার বাবাকে দু-হাজার নগদ টাকা দেব।' তখন তিনি আর লোভ সামলাতে না পেরে, কথা দিয়ে ফেললেন। নিরঞ্জন কবিরত্নকে অনেক দিন আগেই জনার্দন গাঁ-ছাড়া করেছিলেন, কাজেই সৎ-পরামর্শ দেবার কোনো সাহসী লোকও ছিল না।

খবর পেয়ে যেমন কঙ্কাবতীর আর তার মায়ের, তেমনি খেতুর আর তার মায়ের মন দুঃখে ভরে গেল। নিরঞ্জনকে নিয়ে খেতু তনু রায়কে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও তাঁর ছেলে বেশি মারমুখো হয়ে ওদের ভাগিয়ে দিয়েছিল।

গ্রামের অনেকেই এই সম্বন্ধের নিন্দা করছে দেখে মোসায়েবরা একটা অন্য চাল দিল। তারা রটিয়ে দিল যে গদাধর ঘোষ নিজের চোখে কলকাতায় গিয়ে দেখে এসেছে খেতু 'বরখ' বলে একটা জিনিস কিনে, তাই দিয়ে জল ঠাণ্ডা করে খাচ্ছে! সায়েবরা গো-রক্ত দিয়ে বরখ—অর্থাৎ বরফ—তৈরি করে। তাই খেয়ে খেতুর জাত গেছে। কাজেই তাদের একঘরে করা হক। তাদের ধোপা, নাপিত বন্ধ হক; তাদের সঙ্গে এক ঘাটে কেউ স্নান করবে না; যেমন করে হক তাদের এ গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয়, সকলেই ওদের ভালোবাসত, কিন্তু সেকালে সকলেরি এমনি জাত যাবার ভয় ছিল যে কেউ পাশে এসে দাঁড়াল না, এক নিরঞ্জন ছাড়া। এই সময় খেতুও মনে মনে মাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছিল। তবে কঙ্কাবতীর বিয়েটা না দেখে সে যাবে না ঠিক করল।



ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে দিনে দিনে বাগানের ফুলটার মতো কঙ্কাবতী শুকিয়ে যেতে লাগল। তবু সে মা-কে বলত, 'এ বিয়ে হলে বাবা টাকা পেয়ে খুশি হবেন। আমাকে সেই পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে!' এদিকে জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যায়; তেষ্টায় ছাতি ফাটে; কঙ্কাবতী জ্বরের ঘোরে ভুল বকে আর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। বাড়ির লোকে ভেবে আকুল।

* * *

॥ ৪ ॥

হঠাৎ কঙ্কাবতীর মনে হল নদীর ধারে গিয়ে স্নানের ঘাটে বসে গায়ে মাথায় জল মাখলেই তো শরীর ঠাণ্ডা হয়। প্রাণ ভরে নদীর ঠাণ্ডা জল খেলে তো মনের জ্বালাও জুড়োয়। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। কঙ্কাবতী এক দৌড়ে নদীর ধারে গিয়ে ঘাটে বসে মুখে মাথায় জল মাখতে লাগল। এমন সময় কে যেন ওকে ডাকল, 'কেও, কঙ্কাবতী নাকি?' কাউকে কোথাও ঠাওর করতে না পেরে কঙ্কাবতী বলল, 'হ্যাঁ, আমি কঙ্কাবতী।' কে যে কথা বলছে ভেবেই পেল না। সামনে তো খালি একটা মস্ত কাৎলামাছ ঘাঁই দিচ্ছে। সে-ই বলল নাকি?

তা যে-ই হক, সে বলল, 'মাঝ নদীতে গিয়ে ডুব দাও না কেন? জলের নিচে সব ঠাণ্ডা ঘর আছে; গায়ের জ্বালা জুড়োবে, তেষ্টা দূর হবে।'

'অত দূরে যাব কি করে?' 'কেন, জেলেদের নৌকো চেপে চলে যাবে।' সত্যি তো, নদীর তীরে সারি সারি জেলে নৌকো বাঁধা আছে। তারি একটাতে চড়ে বসে, নৌকো ছেড়ে দিল কঙ্কাবতী।

এদিকে বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেছিল। 'কোথায় গেল, কোথায় গেল' করতে করতে দুই দিদি নদীর পাড়ে এসে দেখে ঐ যে নৌকো চড়ে কঙ্কাবতী যায়। দিদিরা আকুলি-বিকুলি করতে লাগল, 'ওরে কঙ্কা ঘরে ফিরে আয়, তুই কি আমাদের ভালোবাসিস্ না?'

নৌকো থেকে কঙ্কাবতী বলল, 'জলের নিচে নাকি সুখ শান্তি দিয়ে ভরা ঠাণ্ডা ঘর আছে ; দিদি, তোমাদের প্রণাম জানিয়ে সেইখানে



যাচ্ছি। হেই কঙ্কাবতীর নৌকোখানি হু—থু যা!' সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা অনেকখানি দূরে চলে গেল।

কঙ্কাবতীর দাদা দেখল এত ধন-সম্পত্তি বুঝি হাতছাড়া হয়! সে এসে বকাবকি করতে লাগল, 'সকলে নিন্দা করবে, বাবা রাগ করবেন, তুমি ছেলেমানুষ, কিচ্ছু বোঝ না। ঘরে ফিরে এসো।' দাদার মনের কথা বুঝে কঙ্কাবতী বলল, 'তুমি ঘরে গিয়ে রাজা হও,

দাদা। কঙ্কাবতীর নৌকোখানা হু—থু যা।' নৌকোটা অমনি আরো খানিকটা এগিয়ে গেল।

আছাড়ি-পিছাড়ি করে কঙ্কাবতীর মা এসে বললেন, 'ওরে বাছা, ফিরে আয়, আমার বুক যে ফেটে যায়। তোর জন্য রাঁধা ভাত শুকোল, ব্যঞ্জন বাসি হল। সাত দিন কিছু খাস্ নি রে মা, ফিরে আয়।' কঙ্কাবতী পাগল পারা, মায়ের ভালোবাসাও ঠেলে দিয়ে বলল, 'তেষ্টায় ছাতি ফাটে, সারা গায়ে আগুন জ্বলে। সেই আগুন নিবোতে যাচ্ছি, মা। হেই কঙ্কাবতীর নৌকোখানি, হু—থু যা।' সঙ্গে সঙ্গে নৌকো প্রায় মাঝ নদীর কাছাকাছি!

তখন নির্বোধ বাপ এলেন লোভ দেখাতে লাগলেন, 'ওরে তুই ফিরে আয়। বাড়িতে তোর বিয়ের ধুম পড়ে গেছে। কত যে কাপড় গয়না টাকা পাবি, তার হিসাব কে রাখে!' আর সইতে পারল না কঙ্কাবতী; বাপকে বলল, 'ও সবে আমার কাজ নেই, বাবা। শরীর মনের জ্বালা আর সইতে পারছি না! হেই, কঙ্কাবতীর নৌকোখানি, ডু-বে যা!'

আশ্চর্য কথা, অমনি নৌকোখানি যেখানে ছিল সেখানেই টুপ করে ডুবে গেল!

* * *



॥ ৫ ॥

নৌকোর সঙ্গে কঙ্কাবতীও ডুবল। ডুবতে ডুবতে একেবারে নদীর তলায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানে আলো আসে ঠাণ্ডা সবুজ সবুজ হয়ে। সেটা মাছদের রাজ্য। কঙ্কাবতী পৌঁছতেই চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল, 'কঙ্কাবতী আসছে! কঙ্কাবতী আসছে!' রুই, কাৎলা, পুঁটি, মৌরলা আর যেখানে যত জলচর জীব ছিল, সবাই এল ভিড় করে; সবাই তাকে আদর করল; সকলেরি সে কি আনন্দ!

তারি মধ্যে বুড়ি কাৎলামাসি, যে ওকে ডেকে এনেছিল, সে বলল, 'আহা, অমন করে ছেঁকে ধর না। এটা তো খেলার সময় নয়। ওর গায়ে বড় জ্বালা, দেখছ না মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। আমার কাছে এসে বস, মা। তারপর তোমার একটা ব্যবস্থা করছি।'

কি ব্যবস্থা হবে, তাই নিয়ে সভা বসল। তপসীমাছের দাড়ি আছে বলে সে সব দিক দিয়ে সভাপতি হবার যোগ্য। তাকেই চেয়ারে বসানো হল। অনেক তর্কাতর্কির পর চতুর বাটামাছের প্রস্তাবই গৃহীত হল। কঙ্কাবতীকে ওদের রানী করা হবে। সে কথা শুনে কঙ্কাবতী বলল, 'আমার গায়ে জ্বর, এখন আমি কি করে রানী হই?' কাৎলামাসিও বলল, 'তাছাড়া রানীর যোগ্য পোষাক-আশাক না পেলে ও রানী হবেই বা কেন?'

মাছরা তাজ্জব বনে গেল, 'তাই বুঝি? মেমদের মতো পোষাক হলে, তবে কঙ্কাবতী রানী হবে?' কঙ্কাবতী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না গো না। আমি সাজতে গুজতে চাই না, কিচ্ছু চাই না। আমার গায়ে ব্যামো, মনে দুঃখ, তাই আমি খালি বসে কাঁদতে চাই।'

বলল বটে, কিন্তু মাছেরা তা শুনবে কেন? তারা মহা পেড়াপিড়ি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কঙ্কাবতী হার মানল, 'বেশ বাপু, না হয়, রানীই হলাম। এখন আমাকে কি করতে হবে?'

'কেন, দরজিবাড়ি যেতে হবে, আবার কি করতে হবে? মাপ দিতে হবে না? কোনো ভয় নেই, সঙ্গে যাবেন কাঁকড়ামশাই, তাঁকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। বুদ্ধিতে চোখ চক্ চক্ করে।'

কাঁকড়ামশাইও এক কথায় রাজি। তাঁদের রানীকে ভালো করে না সাজালে তো সকলেরি নিন্দা হবে। তবে দরজিবাড়ি যেতে হলে তাঁকেও একটু ফিটফাট হয়ে আসতে হবে। পোষাক করতে খরচ লাগে, তাই কচ্ছপকে সঙ্গে নিতে হবে। সে পিঠে করে মোহরের তোড়া নেবে। এই সব করতে করতেই কাঁকড়ামশাই কাপড় ছেড়ে, চুল আঁচড়ে তৈরি হয়ে এলেন। এখন আর রওনা হতে কোনো বাধা নেই। কঙ্কাবতী কি আর করে, তার কথা তো মাছরা শুনবে না। সে-ও উঠে দাঁড়াল।

* * *



॥ ৬ ॥

সবটা পথ হেঁটে যেতে হবে। আগে আগে কাঁকড়ামশাই, তারপর বঙ্কাবতী, সবার পিছনে টাকা নিয়ে কচ্ছপ। অনেকটা জলে, অনেকটা ডাঙায়, তারপর পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে যাওয়া। শেষটা দরজিবাড়ি পৌঁছনো গেল। কাঁচি হাতে বুড়ো দরজি বেরিয়ে



এলেন। কাঁকড়া বললেন, 'এই আমাদের রানী। এঁর জন্য ভালো পোষাক চাই। আছে তোমার কাছে?' দরজি বললেন, 'আছেই

তো। লাল টুকটুকে খেরোর জামাতে বখেয়া সেলাই দিয়ে করে দেব। এজন্মে ছিঁড়বে না। রানী যদি শিমুল তুলোর হয়, তবে তো কথাই নেই।' এই বলে বেচারি কঙ্কাবতীকে টিপে-টুপে বলল, 'কই, তেমন নরম মনে হচ্ছে না তো।'

এবার কঙ্কাবতী চটে গেল। 'এ সব কি হচ্ছে? শিমুল তুলো, খেরোর খোল! আমি কি বালিশ নাকি? এই না আমাকে রানী করলে?' দরজি বিরক্ত হলেন, 'মেয়ের দেখছি আস্পা ভারি! বালিশ না তো কি তাকিয়া হবেন?' এ-কথা শুনে কঙ্কাবতী কেঁদে ফেলল। কাঁকড়ামশাই দাড়া দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। দাড়া লেগে গালটাল একটু ছড়েও গেল। দরজি বললেন, 'রানীর পোষাক করা আমার কর্ম নয়। তোমরা বরং খলিফা সাহেবের কাছে যাও। সে এমন ওস্তাদ কারিগর যে তার তৈরি জামা পরলে খাঁদারো নাক হয়।'

এ-কথা শুনে কাঁকড়া চটে লাল, 'কি? আমার নাক নিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?' দরজি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, তাই কখনো করতে পারি। ঐ তো তোমার খাসা নাক রয়েছে। দেখতে পাওয়া যায় না, এই যা দুঃখের বিষয়।' কাঁকড়াও খুশি হলেন, 'তা বটে। কিন্তু যদি দেখা যেত, সবাই বলত - আহা কি বাঁশির মতো নাক গো!'

এদের কথাবার্তা শুনে কঙ্কাবতী থ। তারপর বিদায় নিয়ে ওরা খলিফার বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি করতেই, তিনি বেরিয়ে এলেন। কাঁকড়ামশাইকে দেখে আদর করে ডেকে নিয়ে চেয়ারে আর কচ্ছপকে টুলে বসালেন। কিন্তু কঙ্কাবতীকে বসতে দেবার কিছু নেই বলে সে দাঁড়িয়ে রইল।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কি আপনার মেয়ে নাকি?'

কাঁকড়া বললেন, 'না, না, আমি বিয়ে-থা করিনি। ইনি আমাদের রানী। এঁর যোগ্য পোষাক করে দিতে পারবেন তো?'

'তা আর পারব না? রেশম, পশম, স্যাটিন, বেনারসি, কিংখাব, জরি, লেস্, কি নেই আমার? তবে রানীর পোষাকে হীরে মোতি বসবে; অনেক টাকা কড়ি লাগবে।'

কাঁকড়া হাসলেন, 'আমাদের টাকার কি অভাব? সোনা রূপো টাকাকড়ি বোঝাই যত জাহাজ নৌকো ডুবে যায়, তাদের সব ধন তো আমরা পাই। আপনি কত চান তাই বলুন।' খলিফা বললেন, 'দু'তোড়া মোহর দিলেই চমৎকার পোষাক হবে।'

কাঁকড়া সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপের পিঠ থেকে দু তোড়া মোহর নিয়ে খলিফাকে দিয়ে দিলেন। খলিফার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। তিনি অনেক রাজারাজড়ার পোষাক করে দিয়েছিলেন, এক সঙ্গে এত টাকা কেউ তাঁকে দেয় নি। এক সঙ্গে এত টাকা দেখে কঙ্কাবতীও ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, 'আমার রাজ পোষাকে কাজ নেই। টাকাগুলো আমাকে দাও না, আমি বাবাকে দিই। তিনি বড় টাকা ভালোবাসেন। আমি না হয় ছেঁড়া কাপড়েই রানী হব।' কিন্তু কে কার কথা শোনে? কাঁকড়ামশাই কঙ্কাবতীকে চুপ করতে বললেন।

খলিফার গিন্নি কঙ্কাবতীর মাপ নিলেন। তারপর অনেকগুলো লোক লাগিয়ে দেখতে দেখতে খলিফা পোষাকও তৈরি করে ফেললেন। সে পোষাক পরে কঙ্কাবতীর রূপ ফেটে পড়তে লাগল। সকলেই দেখে মুগ্ধ হলেন।

তারপর আবার অনেক পাহাড়-পর্বত, স্থল, জল পার হয়ে তিনজনে আবার নদীর তলার মাছদের রাজ্যে এসে পৌঁছলেন।

নতুন পোষাক পরা রানীর সে অতুলনীয় রূপ দেখে মাছরা ধন্য ধন্য করতে লাগল। সকলেই বলল, 'এমন রানী পাওয়া বড় সৌভাগ্য।'



এবার একটা মুশকিল দেখা দিল। এমন চমৎকার পোষাক পরা এমন মনোমোহিনী রানী থাকবে কোথায়? অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক হল রানীকে মোতি-মহলে থাকতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মুক্তো যেখানে তৈরি হয়, সেই ঝিনুকের ভিতরে রানী থাকবেন। কঙ্কাবতীও খুশি হয়ে ঝিনুকের মধ্যে বাস নিল। সেখানে থেকেই সে মাছদের উপর রানিগিরি করতে লাগল।

*   *   *

॥ ৭ ॥

সব দিন কারো কখনো সমান যায় না। এর মধ্যে এক দিন কঙ্কাবতীর বাবার গ্রামের গোয়ালিনী নদীতে স্নান করতে এলে, তার পায়ে ঝিনুকটি লাগল। ডুব দিয়ে সেটি তুলে নিয়ে গোয়ালিনী দেখে ঝিনুক বড় সুন্দর। অমনি সেটিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চালের বাতায় গুজে রেখে দিল।

রোজ গয়লানী দুধের কলসি নিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ যোগাতে যেত। ঘরে দোর দিয়ে, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে তবে সে যেত। সে-ও গেল আর কঙ্কাবতীও ঝিনুক থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে পা দেবা মাত্র দেখল কোথায় তার হীরে-মুক্তো বসানো রাজবেশ? তার জায়গায় গায়ে রয়েছে আগেকার সেই ছেঁড়া কাপড়টি। তা হক গে, রাজবেশ দিয়ে এখানে কি হবে? কঙ্কাবতী কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝাড়ু তুলে নিয়ে, ঘরটাকে দিব্যি সুন্দর ঝাঁটপাট করে, বাসনকোষণ মেজে, তরকারি কুটে, উনুন জ্বেলে, রাঁধা-বাড়া করে, নিজেও খেল, আবার গয়লানীর জন্য ভাত বেড়ে ঢাকা-চাপা দিয়ে রাখল। সে ক্লান্তদেহে ফিরে এসে রাঁধা ভাতটি পেয়ে বড়ই খুশি হল। রোজই এমন হতে লাগল।

এমনি করে দিন যায়। শেষটা গয়লানীর বড়ই কৌতূহল হল। কে রোজ-রোজ তার এমন উপকার করে, তা জানতে হবে। দোরে তো যেমন কুলুপ দিয়ে যায়, ফিরে এসেও তেমনি দেখে। তাহলে কে-ই বা আসে? কি করেই বা আসে? আর থাকতে না পেরে, তার পর দিন সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে, সকাল-সকাল বাড়ি

ফিরল। চুপিসাড়ে দরজা খুলে, নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দেখে রূপে ঘর আলো করে একটি মেয়ে বসে বাসন মাজছে!

সাড়া পেয়েই কঙ্কাবতী ঝিনুকটার দিকে ছুটেছিল, কিন্তু তার আগেই গয়লানী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এ কি কঙ্কাবতী! তুই কোথেকে এলি? তুই না নৌকোডুবি হয়ে মরে গেছিলি?' কঙ্কাবতী বলল, 'ডুবে গেছিলাম সত্যি, কিন্তু মরিনি। মাছদের দেশে ছিলাম। ঐ ঝিনুকটি ছিল আমার ঘর। তা তুমি ঝিনুকটি তুলে নিয়ে এলে আমাকে সুদ্ধু। সেই থেকে আমি তোমার বাড়িতে আছি। কিন্তু সে-কথা কাউকে বল না, মাসি।'

তাই শুনে মাসি নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু কাউকে বলবে না কেন? কঙ্কাবতী বলল, 'খালি হাতে বাড়ি গেলে বাবা যে রাগ করবেন, দাদা গাল দেবেন। মাছদের দেখলাম অনেক টাকাকড়ি আছে। আমার পোষাক করবার জন্য দরজিকে দু-তোড়া মোহর দিল। আমি কত কান্নাকাটি করলাম, তা কিছুতেই বাবার জন্য আমাকে কিছু দিল না। আরেকবার গিয়ে চেষ্টা করে দেখবার ইচ্ছা আছে। যদি কিছু আদায় করতে পারি তবেই আমি বাপের বাড়ি ফিরব।'

এ সব কথা শুনে গয়লানী অবাক হল, 'এমন লক্ষ্মী মিষ্টি মেয়ে, বাপ তাকে টাকার বদলে বেচে দিতে চায়? ছি! ছি!' কিন্তু কঙ্কাবতী বলল, 'আহা, তিনি গরীব মানুষ, সংসার চালাতে কষ্ট হয়। দাদাটা তো মানুষ নয়। তাই আমাকে বেচে টাকা পেতে চান।' শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, কঙ্কাবতী এখন গয়লানীমাসির বাড়িতেই লুকিয়ে থাকবে আর মাসি রোজ দুধ যোগান দিতে গিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সকলের হাঁড়ির খবর তাকে এনে দেবে।

* * *

॥ ৮ ॥

এইভাবে দিন কাটে। কঙ্কাবতী মাসির বাড়িতে বসে তার ঘরকন্নার সব কাজ করে দেয় আর মাসি ছুধের কলসি নিয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রামের সব খবর এনে দেয়। একদিন মাসি এসে বড়ই ছুঃসংবাদ দিল। খেতুর মায়ের বড় অসুখ ; এখন যায়, তখন যায় অবস্থা! তাঁর জ্বর-বিকার হয়েছে। কিন্তু খেতু বরফ খেয়েছিল বলে গ্রামের লোক তাদের একঘরে করেছে ; এই ঘোর বিপদের সময় কেউ পাশে দাঁড়ায়নি। এমন কি জাত যাবার ভয়ে বদ্যিও তাঁকে দেখতে আসেনি। এই মর্মান্তিক কথা শুনে কঙ্কাবতীর চোখ ফেটে জল এল। আহা, খেতুর মায়ের কাছে সে কত ভালোবাসা পেয়েছে। ছোটবেলা থেকে নিজের মায়ের থেকে এতটুকু কম আদর পায়নি!

পরদিন সকাল সকাল কঙ্কাবতী গয়লানীমাসিকে রওনা করে দিল। সে-ও তাড়াতাড়ি কাজ সেরে, বড় ভয়ানক ছুঃসংবাদ আনল। খেতুর মায়ের ছুঃখময় জীবনের অবসান হয়েছে। খেতু এখন বড় বিপদে পড়েছে। মাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে, তার লোক পাচ্ছে না। সবাইকে সে সেধে বেড়াচ্ছে ; জাত যাবার ভয়ে কেউ আসছে না। মানুষের মন কি পাষাণ গো!

সে দিন কঙ্কাবতী রাঁধলও না, খেলও না। মাটিতে পড়ে সারা দিন শুধু কাঁদল। বিকেলে মাসি আরেকবার বেরিয়ে, অনেক রাতে ফিরে এসে বলল, খেতুকে সাহায্য করতে কেউ আসেনি। সে বিচারি একা একাই তিনবারে কাঠের বোঝা শ্মশানে রেখে এসে, এখন মা-কে

কোলে করে নিজেই নিয়ে যাচ্ছে। মাসি দেখে এসেছে একটু দূর যায়, মাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম করে। আবার কোলে তুলে একটু দূর যায়, আবার বিশ্রাম করে। এইভাবে চলেছে।

এ-কথা শুনে কঙ্কাবতীর বুকের সমস্ত ভালোবাসা উথলে উঠল। দরজা খুলে সে ছুটে বেরিয়ে পড়ল, মাসির মানা শুনল না। মাসিও কিছু দূর পিছন পিছন দৌড়েছিল, কিন্তু সে ফিরেও তাকায়নি। একটু পরেই পূর্ণিমার চাঁদে গ্রহণ লাগল ; চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হল। সেই অন্ধকার রাতে মাসি আর কঙ্কাবতীকে দেখতে পেল না, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল।

এদিকে শ্মশানে পৌঁছবার আগেই কঙ্কাবতী দেখল খেতু তার মাকে নামিয়ে, তাঁর মাথাটি কোলে করে বসে আছে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে খেতু আর কেবলি চোখ দিয়ে জল পড়ছে আর দুঃখ করে খেতু বলছে, 'তুমি ছাড়া আমার কেউ ছিল না, মা, তুমিও চলে গেলে? কঙ্কাবতীও চলে গেছে। তবে আর এই দুঃখময় সংসারে আমারি বা বেঁচে থেকে কি হবে?'

এই অবধি শুনে, কঙ্কাবতী খেতুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে খেতু তাকে চিনতে পারল না। কঙ্কাবতী মায়ের পা দুটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে, পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। এবার খেতু তাকে চিনতে পারল।

খেতুর প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি কঙ্কাবতীর আত্মা ফিরে এসেছে। খেতুর মাথার ঠিক ছিল না ; তিন দিন তার ঘুম কিম্বা নাওয়া-খাওয়া হয়নি ; পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ছিল। সব হারিয়ে, সে মা-কে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে আর সেই সময় কি না তার এত ভালোবাসার কঙ্কাবতীর আত্মা তাকে ভয় দেখাতে এসেছে! এত দুঃখও তার কপালে ছিল।

কঙ্কাবতী তখন মুখ তুলে বলল, 'ডুবে গেলেও, মরিনি আমি। কেমন করে বাঁচলাম সে অনেক কথা, সময় পেলে সব বলব। এখন আমি গোয়ালিনী মাসির কাছে আছি। তোমার এই নিদারুণ দুঃখের কথা শুনে ছুটে এসেছি। এসো, দুজনে মিলে মা-কে ঘাটে নিয়ে যাই।'

দুজনে ধরাধরি করে খেতুর মাকে ঘাটে নিয়ে গেল। খেতু চিতা সাজাল। মা-কে স্নান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, চিতায় তুলল। অনেক কাঁদল দুজনে। তারপর খেতু তার মায়ের দেহ দাহ করল। ধূ ধূ করে আগুন জ্বলে উঠল।

এইবার চিতার কাছে বসে কঙ্কাবতী খেতুকে তার সব আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলল। সে-সব কথা বিশ্বাস করার মতো নয় বলে, খেতু ভাবল জ্বরের ঘোরে কঙ্কাবতীর মাথার গোলমাল হয়েছে। এ সমস্ত অসম্ভব ব্যাপার কখনো ঘটতে পারে না। দাহ কাজ হয়ে গেলে, দুজনে নদীতে স্নান করল।

* * *



॥ ৯ ॥

মায়ের কাজ শেষ করে, খেতু কঙ্কাবতীকে বলল, 'চল তোমাকে তোমাদের বাড়িতে রেখে আসি।' কঙ্কাবতীর বড় ভয়, বাবা রাগ করবেন, দাদা গাল দেবেন। তার চেয়ে মাছদের দেশে কিম্বা গোয়ালিনী মাসির কাছে যাওয়াই ভালো। খেতু তাকে বুঝিয়ে বলল নিজেদের বাড়িতে যতই কষ্ট হক, সেখানেই সব সহ্য করে থাকতে হবে। পরের কাছে থাকা ঠিক নয়। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিল বলে বুড়ো জনার্দন তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। জোর করে তার কেউ বিয়ে দেবে না। বাবা দাদার দুর্ব্যবহার এক বছর সহ্য করতে হবে। তার মধ্যে খেতু পশ্চিমে ভালো চাকরি পেয়ে যাবে মনে হচ্ছে। সে এসে তার ভার নেবে। কঙ্কাবতীর বাবাও তখন খুশি হয়ে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

এ কথা শুনে কঙ্কাবতী বলল, 'তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

ভোরবেলা ওরা তনু রায়ের বাড়ির দরজায় পৌঁছল। যাবার আগে খেতু ওকে অনেক সাহস দিয়ে বলল, 'খুব সাবধানে থেকো আর এতদিন কোথায় ছিলে, কি করেছিলে, সে-সব কথা তোমার মাকে ছাড়া কাউকে বল না। দুঃখ কর না; একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

খেতু চলে গেলে, অনেকক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কঙ্কাবতী কাঁদল। ভিতরে ঢুকবার সাহস হচ্ছিল না। শেষে দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিল। তনু রায় ঘুম থেকে উঠে তামাক খাচ্ছিলেন।

কে দরজা ঠেলছে দেখতে দরজা খুলেই কঙ্কাবতীকে দেখে, চাপা রাগে বলে উঠলেন, 'কঙ্কাবতী, তুমি মরনি বুঝি? তা যেখানে এতদিন ছিলে, আবার সেখানেই যাও। এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হবে না।'

কঙ্কাবতীর দাদাও রেগে উঠল, 'যাবার একটা জায়গা জুটল না বুঝি, তাই ফের এসেছিস্! শুনে রাখ্, এখান থেকে তোর ভাত উঠেছে। জনার্দন চৌধুরীও তোকে বিয়ে করবে না। কেউ জানতে পারার আগে ওকে দূর করে দাও, বাবা!'

গোলমাল শুনে কঙ্কাবতীর দুই দিদি আর মাও বেরিয়ে এসে দেখেন দোর-গোড়ায় ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে কঙ্কাবতী কাঁদছে আর তার বাপ-দাদা তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে! কারো দিকে না তাকিয়ে, মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আয়, মা, আয়। দুঃখিনী মাকে ফেলে কোথায় গেছিলি, মা?'

মায়ের বুকে মাথা রেখে কঙ্কাবতীর মনের কষ্ট দূর হল। তখন কঙ্কাবতীর মা এক হাতে কঙ্কাবতীর হাত ধরে, অন্য হাতে অন্য দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মুখ তুলে স্বামী-ছেলেকে বললেন, 'নির্দোষ মেয়েকে দূর করে দেবে, বটে! থাকো তোমাদের জাত-ধর্ম নিয়ে পরম সুখে। আমরা চার জন চলে যাচ্ছি। দোরে দোরে ভিক্ষে করে খাওয়াও এখানে থাকার চেয়ে শতগুণে ভালো।'

স্ত্রী সত্যি সত্যি মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে, ব্যস্ত হয়ে তনু রায় বললেন, 'ও কি করছ, গিন্নি, তোমরা যাবে কেন? ওকে নিয়ে আমি কি করতে পারি? ওর আর বিয়ে-টিয়ে হবে না। ওর যেখানে ইচ্ছা চলে যাক। তোমরা থাকো।'

কঙ্কাবতীর মা বললেন, 'কে বলেছে বিয়ে হবে না? ওর বিয়ের জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি ভাবব। তোমাদের আসল

দুঃখের কারণ হল জনার্দনের অতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল। সে যাই হক, আমরা চলে যাচ্ছি।'

স্ত্রীর এত তেজ তনু রায় ভাবতে পারতেন না। বয়স হওয়াতে একটু আয়েসীও হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রী চলে গেলে সেবাটি কোথায় পাবেন? ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আহা, তাই বলে কি সত্যি যেতে বলছি নাকি? যাও, তোমরা সকলে ভিতরে যাও। কঙ্কাবতী, তুমিও ভিতরে যাও, মা।'

এইভাবে সেদিনকার পালা সাঙ্গ হল।

*   *   *



॥ ১০ ॥

সেদিনকার গোলমাল মিটে গেলেও, কঙ্কাবতীর উপর তার বাবা-দাদা বড়ই অসন্তুষ্ট। অমন রাজার মতো বর ফস্কে গেল। এ মেয়ে চিরকাল আইবুড়ো থাকবে। কঙ্কাবতীর মা স্বামীকে খালি বলেন, 'এক বছর চুপ করে থাক তো। তারপর আমিই মেয়ের বিয়ে দেব। বেশি বকাবকি করলে কিন্তু আমরা সত্যি চলে যাব।' আজকাল তনু রায় স্ত্রীকে বেশ ভয় করেন, তাই বেশি কিছু বলতে সাহস পান না।

কিন্তু বছর ঘুরে এল, তবু খেতুর দেখা নেই। মায়ের শ্রাদ্ধ করতে তার কাশী যাবার কথা; তারপর কোথায় একটা ভালো কাজ পেয়ে, তবে এখানে আসবে। কি জানি, কোনো বিপদে-টিপদে পড়েনি তো? তনু রায়ের মেজাজও আজকাল সর্বদা খিঁচড়ে থাকে। মাঝে মাঝে রাগে ফেটে পড়েন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তনু রায় তো খুব রাগমাগ করছেন। এক সময় জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'সেকালের রাজারা যেমন বলতেন, সকালে চোখ খুলে যাকে প্রথম দেখব, তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব! আমিও এখন তাই বলি। ব্রাহ্মণ হক, চণ্ডাল হক, জন্তুজানোয়ার—এমনকি বাঘ এসেও যদি কঙ্কাবতীকে বিয়ে করতে চায়, আমি তাই দেব!'

বাপের মুখ দিয়ে এই-কথা যেই না বেরিয়েছে, অমনি বাড়িঘর কাঁপিয়ে বাঘের ডাক শোনা গেল। সে কি গর্জন! 'তা হলে দরজা

খুলুন, রায় মশাই !' অমন হুংকার শুনে তো তন্নু রায় ভয়েই আধমরা ! কে অমন বেঘো স্বরে কথা বলছে দেখবার জন্যে, যেই না একটু দরজা ফাঁক করেছেন, অমনি আঁতকে উঠে দেখেন বিশাল এক ডোরা-কাটা বাঘ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ! দরজা খুলতেই বাঘটাও ঘরে এসে ঢুকল। তন্নু রায়ের সারা গা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

বাঘ বলল, 'এই যে বললেন বাঘ এসে মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে, তারি সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। দিন তাহলে আমার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে। না দিলে কিন্তু আপনাকে খেয়ে ফেলব।' বাঘ দেখে তন্নু রায়ের আত্মাপাখি খাঁচাছাড়া হলেও, এমনি তাঁর টাকার লোভ যে ভয় চেপে বললেন, 'তা আমি বলেছি যখন, তখন নিশ্চয়ই দেব। মুখ দিয়ে যা বলি, আমি কাজেও তা করি। কিন্তু জানই তো আমি বংশজ কুলীন ; আমাদের মেয়ে বিয়ে করতে গেলে, টাকা দিতে হয়। এটা বাপু আমাদের কুলধর্ম, এ নিয়ম তো আমি ভাঙতে পারি না।'

বাঘ জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা পেলে আপনার কুলধর্ম বজায় থাকে ?' সুবিধা বুঝে তন্নু রায় বললেন, 'গাঁয়ের জমিদার জনার্দন চৌধুরীর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের কথা হয়েছিল। নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। তিনি ছিলেন সত্যি মানুষ, উপরন্তু বামুন। তিনি দু-হাজার টাকা আমাকে দিতে রাজি ছিলেন। তুমি সেখানে বাঘ। কাজেই কিছু বেশি দিও।'

বাঘ বলল, 'আপনাদের নিয়ম আমি ভালো করেই জানি। এত টাকা দেব যা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।' এই বলে মহা গর্জন করতে করতে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। তন্নু রায়ের চক্ষু চড়ক গাছ। এবার সব চেটেপুটে খেয়ে ফেললেই

তো হয়ে গেল! কি আর করেন, তিনিও সঙ্গে গেলেন। গুণধর ছেলে তখন বাড়ি ছিল না। তিন মেয়ে আর মা তো বাঘের ডাক শুনে ভয়ে কাঠ। বাঘ একেবারে তাঁদের সামনে গিয়ে মস্ত এক তোড়া মোহর ঝনাৎ করে ফেলে দিল!

তনু রায় তাড়াতাড়ি তোড়াটি নিয়ে প্রদীপের কাছে গিয়ে, চশমা এঁটে মোহর গুণতে বসলেন।

সেই সময়ে কঙ্কাবতী আর তার মায়ের কাছে গিয়ে বাঘ বলল, 'তোমাদের কোনো ভয় নেই!' গলার স্বর শুনে তাঁরা চমকে উঠলেন। এতো বেঘো গলা নয়; এ গলা যে তাঁদের বড় চেনা, বড় আদরের। সে গলা শুনে দুজনার মন আনন্দে ভরে গেল।

বাঘ ততক্ষণে আবার তনু রায়ের কাছে থাবা গেড়ে বসেছিল। তোড়ার মধ্যে তিন হাজার মোহর ছিল। তনু রায়ের মনে হল, বাঘ তাতে কি হয়েছে? এ-ই আমার মনের মতো জামাই হল!

বাঘকে বললেন, 'আজ রাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করছি। তুমি বাঘ বলে কি তোমার অনাদর করতে পারি? এখন জনার্দন চৌধুরী এসে সাধলেও তাকে মেয়ে দেব না।' তাঁর মনে ভয় ছিল কঙ্কাবতীর মা না এ বিয়েতে বাধা দেন। তাই তাঁকে বললেন, 'এই আমার ভালো জামাই হল। তুমি একটি কথাও বলতে পাবে না। তাহলে জামাই তোমাকে খেয়ে ফেলবে।'

কঙ্কাবতীর মা মনের খুশি লুকিয়ে রেখে বললেন, 'তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর। আমি কিছু বলব না।'

* * *



॥ ১১ ॥

তন্নু রায়ের হাতে এখন অনেক টাকা। ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে, দেখতে দেখতে সব আয়োজন করে ফেলা হল। পাড়াপ্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন করে আনা হল। নাপিত এল, পুরুত এল। সেই রাতেই বাঘের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে হয়ে গেল। টাকাকড়ি পেয়ে তন্নু রায় আনন্দ রাখার জায়গা পান না। পড়শীদের কখনো বলেন, 'আমার জামাই নিয়ে তোমরা এবার আমোদ-আহ্লাদ কর। সে যেন মনে কষ্ট না পায়।' কখনো বাঘকে বলেন, 'বাসরে গান গাইতে হয়, জান তো বাবাজি?' বাঘও লক্ষ্মী বরের মতো মাথা নিচু করে বসেছিল, কোনো উৎপাত করেনি।

সূর্য উঠবার আগে বাঘ তন্নু রায়কে বলল, 'পথে লোকজন বেরোবার আগে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আমার সঙ্গে দিয়ে দিন।' এ-কথা শুনে পড়শী মেয়েরা কঙ্কাবতীকে সুন্দর করে সাজিয়ে-গুজিয়ে, চুল বেঁধে দিল। কঙ্কাবতীর মা বাড়িতে যে কখানা ভালো কাপড় ছিল, সেগুলি গুছিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তন্নু রায় বললেন, 'ও সব রাখ! বাঘের যথেষ্ট আছে, কঙ্কাবতীর কোনো অভাব হবে না। তোমার কোনো বুদ্ধি নেই।'

তাই শুনে কতকগুলো ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়চোপড় দিয়ে পুঁটলি বেঁধে, কঙ্কাবতীর মা কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে বাঘের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। মনের ভরসা শুধু বাঘের সেই কথাগুলো।

এদিকে পুটলি হাতে বাঘের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, বাঘ বলল, 'কঙ্কাবতী, অনেক দূর যেতে হবে। তুমি ছেলেমানুষ, অত হাঁটতে পারবে না। আমার পিঠে উঠে, শক্ত করে আমার লোম



ধরে থাক।' কঙ্কাবতী তাই করল। বাঘ তাকে নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল।

বনের মাঝখানে বাঘ একবার মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার ভয় করছে?' কঙ্কাবতী বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, ভয় করবে কেন?' তারপর বাঘ আবার বলল, 'দেখ, আমি কেন বাঘ হয়েছি, সে-কথা তোমাকে পরে বলব। তবে তুমি কিছু ভেবো না, শীগ্‌গিরই আমি নিজের চেহারা ফিরে পাব। এখন কিছু জানতে চেয়ো না।'

তারপর ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে একটা উঁচু পাহাড়ের কাছে ওরা পৌঁছল। বাঘ বলল, 'এবার তুমি একটু চোখ বোজ। আমি না বললে খুলো না।' কঙ্কাবতী চোখ বুজল। বাঘ ওকে নিয়ে ছুটে চলল। হঠাৎ একটা বিশ্রী খল্ খল্ হাসি কানে এল। কঙ্কাবতী শিউরে উঠে বলল, 'অমন বিশ্রী করে কে হাসছে?' বাঘ বলল, 'পরে সব কথা বলব। এখন চোখ খোল।'

কঙ্কাবতী চোখ খুলে অবাক্ হল। পাহাড়ের বুকের ভিতর চমৎকার একটা প্রাসাদে সে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে ঢুকবার একটি মাত্র পথ হল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। তারি মধ্যে দিয়ে তারা এসেছে। চার দিকে দিনের আলো, কারণ পাহাড়ের চূড়োর কাছে ফাঁক আছে। সেখান দিয়ে রোদ ঢুকছে। কিন্তু বাইরে থেকে ফাঁকটা ঠাওর হয় না।

প্রাসাদের কথা আর কি বলব! শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো, নানা রকম চমৎকার দামী দামী আসবাব দিয়ে সাজানো বড় বড় ঘর। তাতে হীরে মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি। ঘর সাজাবার, আরাম করবার অজস্র জিনিস; সাজপোষাক, গয়নাগাঁটি উপচে পড়ছে। নেই শুধু কোনো খাবার জিনিস। এই আশ্চর্য বাড়িতে ঢুকেই বাঘ বলল, 'একটা বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকবে, কঙ্কাবতী। আমি যা হাতে করে তোমাকে দেব, তা ছাড়া কোনো জিনিস ছোঁবে না। এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকবে।'

এই বলে বাঘ বেরিয়ে গেল। একটু পরেই খেতু এসে বলল, 'দেখ তো আমাকে চিনতে পার কিনা।' কঙ্কাবতী মাথা নিচু করল। খেতু বলল, 'তোমার কি ভয় করছে?' কঙ্কাবতী আস্তে আস্তে বলল, 'না, একটুও ভয় করছে না।' খেতু বলল, 'এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ না থাকলেও, যে কোনো সময়ে বিপদও ঘটতে পারে।' 'কি বিপদ?' 'সে এখন শুনে কাজ নেই। মোট কথা এক বছর খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোনো জিনিস নিজে তুলে নেবে না। আমি হাতে করে দিলে, তবে নেবে। এক বছর পরে এ সব ধনরত্ন আমাদের হয়ে যাবে। তখন আমরা সব নিয়ে দেশে ফিরতে পারব। আচ্ছা, বিয়ের সময়ে আমাকে চিনতে পেরেছিলে কি?'

কঙ্কাবতী বলল, 'নিশ্চয় পেরেছিলাম। মা আর আমি এক বছর ধরে তোমার পথ চেয়ে ছিলাম। তবু তুমি যখন এলে না, আমরা কত কাঁদতাম। কাল যখন বাঘ হয়ে তুমি এলে, তোমার গলা শুনেই আমরা চিনতে পারলাম। তারপর তুমিও বললে—কোনো ভয় নেই—তখন কি আর না চিনে পারি?'

খেতু বলল, 'অনেক দুঃখ সয়েছি দুজনে। আর এক বছর সাবধানে থাকতে পারলেই, আবার আমরা সুখী হব। দুঃখ হয় আমার মায়ের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। দেখ কঙ্কাবতী, এর পর সর্বদা যতদূর পারি দুঃখীদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করব।'

কঙ্কাবতী বলল, 'তোমার মা চলে যাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত কি কি হয়েছিল, কেন তুমি বাঘ হয়েছ, সে-সব কথা আমাকে বলবে না?' খেতু বলল, 'এখনো নয়, এক বছর পরে বলব।' কঙ্কাবতী লক্ষ্মী মেয়ে, আর কিছু বলল না।

পাহাড়ের বুকের ভিতরে ঐ প্রাসাদে ক্রমে দশ মাস কেটে গেল।

সর্বদা ওরা সাবধানে থাকত। কঙ্কাবতী হাতে করে কোনো জিনিস নিত না। শুধু খেতু যা দিত, তাই নিত। প্রাসাদে কোনো খাবার জিনিস ছিল না। খেতু ফলমূল নিয়ে আসত, তাই খেয়ে থাকত দুজনে। বাইরে বেরোলেই খেতু বাঘের রূপ ধরত ; বাড়িতে কঙ্কাবতীর সেই চিরদিনের চেনা খেতু।

এই দশ মাস কঙ্কাবতী মাকে দেখেনি। মা-ও তাদের কোনো সংবাদ পাননি। মাঝে মাঝে তাই তার বড় মন কেমন করত। মা না জানি কত দুর্ভাবনার মধ্যে আছেন। খেতু তাকে বুঝিয়ে বলত, 'আর তো দুটো মাস। তারপর আমরা নিরাপদে সেখানে যেতে পারব। এখন বড় ভয় হয়, যদি কোনো বিপদ ঘটে। তাছাড়া বেরোলেই বাঘের রূপ ধরতে হবে, সে-ও আমার ভালো লাগে না। যাই হক, কাল তোমাকে নিয়ে যাব। না হয় এই দু-মাস তুমি সেখানেই থাক না কেন?'

কঙ্কাবতী তাতে রাজি হল না। সে মাকে দেখেই ফিরে আসতে চায়।

* * *



॥ ১২ ॥

এর পর দিন সন্ধ্যাবেলায়, আবার বাঘের রূপ ধরে, কঙ্কাবতীকে পিঠে করে খেতু রওনা হল। যাবার আগে কঙ্কাবতীকে তার মা বাবার জন্যও অনেক টাকা কড়ি দিল। অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরোবার সময় খেতু তাকে চোখ বুজতে বলল। সেই সময় আবার সেই বিশ্রী হাসিটা কানে এল। সুড়ঙ্গের বাইরে এসে খেতু বলল, 'এবার চোখ খোল।'

বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক প্রহর রাতে ওরা তনু রায়ের বাড়িতে পৌঁছল। মা, দিদিরা এত দিন পরে কঙ্কাবতীকে দেখে আর বাবা, দাদা এতগুলো টাকা পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু জামাইকে কি খাইয়ে আপ্যায়ন করবেন, তনু রায় ভেবে পেলেন না। মা তো মেয়ের জন্য মাছ তরকারি রাঁধতে বসলেন, এদিকে বাপ গিয়ে বাঘ জামাইকে বললেন, 'এত দূর হেঁটেছ, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে? আমাদের বাড়িতে তো খালি ভাত-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা, তাতে কি তোমার খিদে মিটবে? গোয়ালে বুড়ি গাইটা আছে, দুধ দেয় না, খালি খায়। সেটা দিয়ে চলবে না?' বাঘ জামাই বলল, 'না, না, দুপুরে অনেক খেয়েছি। এখন আমার খিদে নেই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, গাই খাবে না তো না-ই খেলে। নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাও না কেন? ব্যাটা বড় ঝগড়া করে। এ গাঁ থেকে উঠে তার মামার বাড়ির গ্রামে থাকে। আমি পথ বাৎলে দিচ্ছি। গিয়ে খেয়ে এসো না কেন। আমারো হাড় জুড়োয়।'

বাঘ-জামাই তবু রাজি হল না। তখন তনু রায় বললেন, 'বেশ,

অতদূর যেতে না চাও, এই গাঁ-তেই এক গয়লানী আছে, সে আমাকে বড় জ্বালায়। তোমাকে মেয়ে দিয়েছি বলে যা-নয়-তাই বলে নিদেন তাকেই খাও। কিছু না খেয়ে ফিরে গেলে, লোকে আমার নিন্দে করবে। এর পরের বার কিন্তু না খেয়ে যেতে পাবে না।'

এদিকে কঙ্কাবতী মা-কে চুপিচুপি বলল যে বাঘ আসলে খেতু। আর দু-মাস পরে তারা টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরবে। তনু রায় আর যাই হন, বোকা ছিলেন না। তিনি কঙ্কাবতীর কানে কানে বললেন, 'আমার বিশ্বাস জামাই আসলে বাঘ নয়। ওর মাথায় কোনো শিকড় টিকড় বেঁধে, কেউ ওষুধ করে ওকে বাঘ বানিয়ে দিয়েছে। শুনেছি ঐ ভাবে মন্ত্র বলে মানুষকে বাঘ করা যায়। নইলে ভালো ভালো বেঘো খাদ্য খেতে চায় না কেন? তুমি ওর মাথায় যদি শিকড় পাও, সেটাকে পুড়িয়ে ফেলো। তাহলেই মন্ত্র কেটে গিয়ে, ও আবার মানুষ হবে।'

মা এ-কথা শুনে বললেন, 'অমন কাজও কর না, মা। খেতু বড় ভালো ছেলে। সে যেমন বলেছে, সেই মতোই কাজ কর। কখনো তার কথা অমান্য কর না।'

ভোর বেলা বাঘের পিঠে চড়ে কঙ্কাবতী সেই প্রাসাদে ফিরে এল। এবারো সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছে খেতু ওকে চোখ বুজতে বলল। এ-বারো সেই বিকট হাসি শোনা গেল।

ফিরে এসে আবার আগের মতো দিন যেতে লাগল। সময় যেন আর কাটতে চায় না। দু-মাস থেকে এক মাস হল; এক মাস থেকে কমতে কমতে মাত্র দশ দিন বাকি রইল। খেতুর মনে বড় আনন্দ। আর দশ দিন পরেই ধনরত্ন আর লক্ষ্মী স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। কিন্তু কঙ্কাবতীর মনে বড় অশান্তি।

* * *

॥ ১৩ ॥

কঙ্কাবতীর বোধ হয় কিছু বুদ্ধিভ্রম হয়ে থাকবে। তাই ঐ শেষের দশটা দিন তার কাছে অসহ্য বলে মনে হতে লাগল। মনকে সে বোঝাল তার এই অস্থিরতা মূল খেতুরি জন্য। যত শীগ্‌গির দেশে ফেরা যাবে, খেতু তত সুখী হবে। এখনি না যাবার একমাত্র কারণ তার ঐ বাঘের রূপ। ঘরে সে খেতু হলেও, দেশে যেতে হলে তাকে বাঘ হয়ে যেতে হবে। আজই যদি তার বাঘ রূপ ঘুচে যায়, তাহলে কালই সে দেশে ফিরে যেতে পারবে।

কি করে সেটা সম্ভব হতে পারে ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে গেল। বাবা বলেছিলেন অনেক সময় শত্রুরা মন্ত্র বলে মানুষকে বাঘ বানিয়ে দেয়। একটা বিশেষ শিকড় দিয়ে ওষুধ করে তারা। শিকড়টা চুলে বেঁধে দেয়। সেটাকে খুলে পুড়িয়ে ফেললেই বাঘ আবার সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যায়। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মা এ সব করতে একেবারে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে দুষ্টু লোকদের মৎলবের ফলে তার স্বামী আরো দশ দিন কষ্ট পাবেন? তাছাড়া মা যত ভালোই হন, বাবার তো জ্ঞানবুদ্ধি বেশি। শাপ থেকে মুক্তি পেলে খেতুও কত খুশি হবেন। কিছুতেই আর সে মন ঠিক করতে পারে না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে কঙ্কাবতীর হঠাৎ আরব্য উপন্যাসে পড়া তিলকসুন্দরী আর ভুস্‌কুমড়োর গল্প মনে পড়ে গেল।

দেশের রাজকুমার তিলকসুন্দরীর রূপ দেখে তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। তিলকসুন্দরীর মা ছিল না ; ঘরে ছিলেন সৎমা। তাঁর আবার ভুস্‌কুমড়ো বলে এক মেয়ে ছিল। সৎমা তখন একটা বুদ্ধি করলেন। তিলকসুন্দরীর চুলের মধ্যে একটা মন্ত্র পড়া শিকড় বেঁধে দিলেন।

তিলকসুন্দরী অমনি পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে, গাছের ডালে বসল। সৎমা তখন ভুস্‌কুমড়োকে সাজিয়ে-গুজিয়ে, ঘোমটা পরিয়ে, রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। রাজকুমার ভাবলেন বুঝি তিলকসুন্দরীই তাঁর বৌ হয়েছে। তাকে তিনি নানা মিষ্টি কথা বলে আদর করতে লাগলেন। তখন গাছ থেকে তিলকসুন্দরী পাখি বলল, 'ভুস্‌কুমড়ো কোলে, তিলকসুন্দরী ডালে!'

অবাক হয়ে রাজকুমার পাখিটাকে ডাকলেন। সে এসে তাঁর হাতে বসল। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, মাথা থেকে শিকড়টা খুলে পড়ে গেল। অমনি মন্ত্র কেটে গেল, পাখিও আবার তিলকসুন্দরী হয়ে গেল। রাজপুত্র তখন ভুস্‌কুমড়োকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে, তিলকসুন্দরীকে বিয়ে করে, সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

তখন অনেক রাত। গল্প মনে পড়তেই কঙ্কাবতী উঠে অন্য ঘরে গিয়ে বাতি জ্বেলে, খাটের পাশে এসে ঘুমন্ত খেতুর মাথায় সাবধানে শিকড় খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে দেখে সত্যিই একটা শিকড় চুলের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে! পাশের ঘর থেকে কাঁচি এনে, শিকড় কেটে নিয়ে, কঙ্কাবতী সেটিকে তক্ষুণি প্রদীপের শিখাতে পুড়িয়ে ফেলল।

শিকড় থেকে বিশ্রী একটা গন্ধ বেরোতে লাগল। খেতুও চমকে জেগে উঠল। মাথায় হাত দিয়ে দেখল শিকড় নেই। অমনি সে

সব কথা বুঝে নিল আর কাঁপতে কাঁপতে কঙ্কাবতী অজ্ঞান হয়ে গেল। তার হাত থেকে প্রদীপটি নিয়ে খেতু তাকে আস্তে আস্তে খাটে



শোয়াল। জল এনে কপালে ছিটোতেই তার জ্ঞান ফিরে এল। তখন কঙ্কাবতীর অনুতাপের শেষ রইল না। সে যে কি মর্মান্তিক কাজ করেছে, সে বুঝতে পারল। খেতুই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তোমার কোনো দোষ হয়নি। যদি তোমাকে সব কথা খুলে বলতাম, তাহলে এমন হত না। কিন্তু না জেনেও শিকড় যখন পুড়িয়ে ফেলেছ, তখন আর কোনো উপায় নেই। এখনি তোমাকে এ জায়গা ছেড়ে

চলে যেতে হবে। সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে যাবে। সূর্য উঠলে, সূর্যকে ডান হাতে রেখে এগিয়ে গেলেই, তোমাদের গ্রামে পৌঁছবে। দশদিন পরে লোকজন নিয়ে এখানে এসো। তখন আর কোনো ভয় থাকবে না। এখানকার সব ধন-দৌলত নিয়ে চার-ভাগ করবে। এক ভাগ রামহরিকাকাকে দেবে; এক ভাগ তোমার বাবাকে; এক ভাগ নিরঞ্জন কাকাকে দেবে। বাকি এক ভাগ তুমি নিয়ে, ধর্ম-কর্ম দান-ধ্যান করে জীবন কাটাবে। তারপর আমি যেখানে যাচ্ছি, একদিন তুমিও সেখানে যাবে। আবার দেখা হবে।'

এ সব কথা শুনে দুঃখে কঙ্কাবতীর বুক ফেটে যাচ্ছিল। সে বলল, 'তোমাকে ফেলে আমি কোথাও যাব না। ধনরত্নে আমার কাজ নেই। তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকব। তোমার যা হবে, আমারো তাই হবে।'

খেতু তার মুখের দিকে চেয়ে দেখল সে মুখ থেকে যেন আলো বেরোচ্ছে। খেতু বুঝল কঙ্কাবতীকে কিছু বলে লাভ নেই, সে কখনোই তাকে ছেড়ে চলে যাবে না।

এতদিন পরে খেতু কঙ্কাবতীকে সব কথা খুলে বলল। সে বড় ভয়ংকর কথা।

*　　*　　*



॥ ১৪ ॥

খেতু যখন সেই আশ্চর্য নিদারুণ কথা খুলে বলল, কঙ্কাবতীর মনে যত না ভয়, তার চেয়ে বেশি সাহস এল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার যদি কোনো সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে খেতুকে বাঁচাবেই। তার জন্যে যা করতে হয়, সব চেষ্টা করে দেখবে।

মায়ের শেষ কাজ করে খেতু কাশী গেছিল। সেখানে মায়ের শ্রাদ্ধ করল। তারপর চারদিকে কাজের চেষ্টা করতে লাগল। তার মতো গুণী ছেলের, বিশেষ করে সে যখন খাটতে ভয় পায় না, চাকরি পাওয়া খুব শক্ত হল না। ভাল চাকরিই হল। তার রোজগারও খুব কম হত না। যেটুকু খরচ না করলেই নয়, সেইটুকুমাত্র খরচ করে, আধপেটা খেয়ে, খেতু কঙ্কাবতীর বাপের জন্য টাকা জমাতে লাগল। কাজের লোক রাখত না, নিজেই সব কাজ করত। রাত থাকতে উঠে গঙ্গা থেকে জল আনত। জল-খাবারের বদলে গঙ্গাজল খেত। এইভাবে শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে গেছিল, কিন্তু দু হাজার টাকা জমাতে পেরেছিল।

এবার একটা ব্যাগে টাকাগুলো ভরে, সে রেলগাড়িতে উঠে বসল। মনে বড় আনন্দ; টাকা দিলেই কঙ্কাবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে।- গ্রামে.সেকালে নোট চলত না, তাই সবটাই নগদ টাকায় নিয়ে, সাবধানে আগলে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। পাছে কেউ চুরি করে, এই ভয়ে একবারো নেমে জলখাবার পর্যন্ত কিনল না।

ঐ গাড়িতে মাত্র আর একজন লোক ছিল। সে একটা বড়

স্টেশনে জলখাবার কিনবার জন্য নামবার সময়ে ওকে জিজ্ঞাসা করল ওর জন্যেও কিছু আনবে কিনা। খেতু খুশি হয়ে তাকে পয়সা দিল। কিছুক্ষণ পরে সে খাবার নিয়ে ফিরে এল। সেটি খাবার একটু পরেই খেতুর মাথা ঘুরতে লাগল, তারপর আর কিছু মনে নেই।

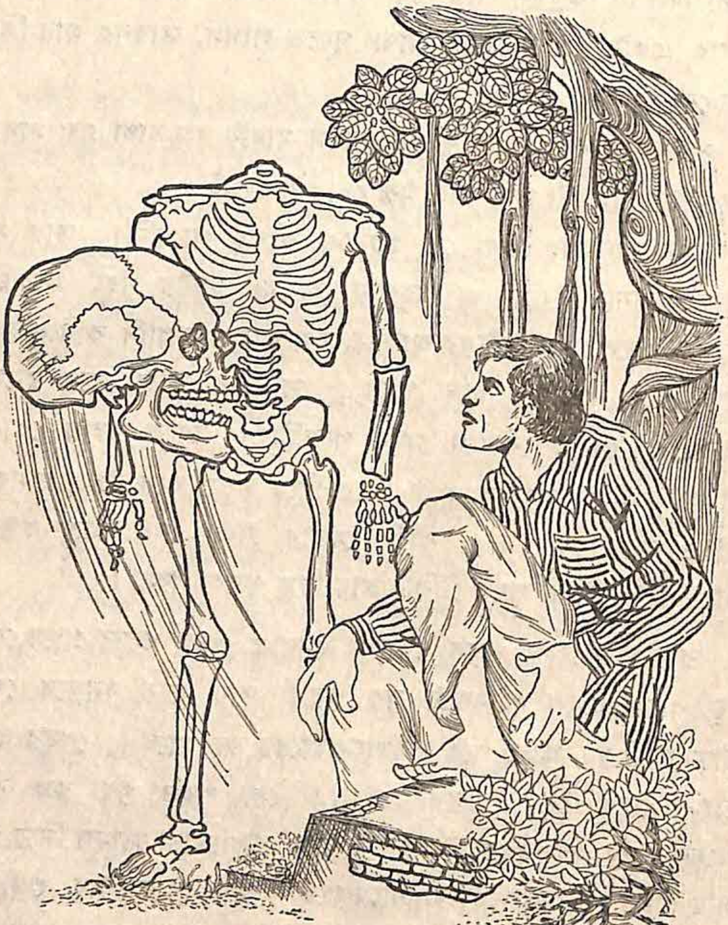
সকালে ঘুম ভাঙতে বুঝতে পারল মাথায় বড় ব্যথা এবং মাথার কাছে রাখা ব্যাগটা আর সেই অন্য লোকটাও নেই।

এমন সর্বনাশের কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার সব আশা ধূলিসাৎ হল। এ অবস্থায় যা যা করণীয় সবই করেছিল খেতু। রেলের কর্মচারীদের জানিয়ে, সব কামরা তল্লাসি করিয়েছিল। কিন্তু চোর কি আর বসে থাকে? সে তার কাজ সেরে রাতের অন্ধকারে কোনো স্টেশনে নেমে পড়েছিল। তাকে ধরার কোনো আশাই নেই। আবার কাশী ফিরে গিয়ে নতুন করে টাকা জমাবার চেষ্টাও করা গেল না। কাশী ফেরার টাকা নেই তার কাছে। আছে শুধু রানীগঞ্জ পর্যন্ত টিকিট আর কিছু খুচরো পয়সা।

রানীগঞ্জে নেমে পড়ল খেতু। সেখান থেকে ওদের গ্রামে যেতে বড় রাস্তা ধরলে খানিকটা ঘুর হয়। তার চেয়ে বনপথে গেলে তাড়াতাড়ি হয়, যদিও পথে জন্তুজানোয়ারের ভয় আছে। খেতুর যথেষ্ট সাহস, তাই সে বনপথেই চলল। সে পথও খুব কম নয়। অনেক দিন লাগত সে সময়। বনের গাছ থেকে ফলমূল নিয়ে খেত আর হাঁটত। রাতে কোনো গ্রামে-গঞ্জে আশ্রয় পেলে ঘরে শুত, না পেলে গাছতলায় পড়ে থাকত।

চারদিন পরে একটা উঁচু পাহাড়ের কাছে পৌঁছল। আগ্রহের চোটে সে রাতে বিশ্রাম না করে ক্রমাগত হাঁটতে লাগল। চাঁদ

ডুবে গেলে, বন এমনি অন্ধকার হল যে আর এগোনো যায় না। এমন সময় সামনে একটা মন্দির পড়ল। দুঃখের বিষয়, মন্দিরে



কোনো লোক ছিল না যে একটু খেতে দেয়। বহুদিন এ-মন্দিরে মানুষের পা পড়েনি। কি আর করে মন্দিরের চাতালে শুয়ে খেতু

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় ঠক্ ঠক্ শব্দ করে সাদা একটা মড়ার মাথা সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এল।

উঠেই খেতুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল আজকালকার ছোকরারা দুপাতা ইংরিজি পড়েই ভূতে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়েছে। এতে ভূতরাও অপমান বোধ করে একটা দল গড়েছে। তার ইংরিজি নাম দিয়েছে স্কাল স্কেলিটন কোম্পানি। বেগতিক দেখে খেতু বলল, 'না, না, ভূতে আমার বরাবর বিশ্বাস ছিল। এখন তা আরো বাড়ল।' স্কাল তখন একটা মুণ্ডুহীন স্কেলিটনকে ডেকে সব কথা বলল। স্কেলিটনের মুণ্ডু নেই তাই হাড় ঝম ঝম করে কথা বলে। সে মহা খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে তো একে একটা পুরস্কার দিতে হয়। ভক্তদের টাকাকড়ি দিলে তাদের ভক্তি বাড়ে। ভাই স্কাল, তুমি একে অর্থ দাও।'

খেতু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এমনিতে আমি লোভী নই, যদিও সম্প্রতি টাকার অভাবে নিতান্ত আতান্তরে পড়েছি। তবু টাকা দিয়ে আমাকে ভক্ত বানাবার দরকার নেই।' এ কথা শুনে ভূতরা দুজন আরো খুশি হয়ে বলল, 'না, না, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমাদের সঞ্চিত ধনে তো আর আমাদের দরকার নেই। সেগুলি তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি। এমন যোগ্য লোক আর পাব না।'

*　　*　　*



॥ ১৫ ॥

তারা দুজনে খেতুকে ঐ পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেলে, স্কাল বলল, 'হাজার বছর এ জায়গাটা কেউ সাফ করেনি। কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে।' তখন তিনজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে ওখানকার ঝোপঝাপ আগাছা তুলে ফেললে, পাহাড়ের গায়ে খানিকটা গাঁথুনি দেখা গেল। এর পর তিনজনে মিলে খুঁড়ে খুঁড়ে গাঁথুনির পাথর আল্গা করতেই একটা সুড়ঙ্গ পথের মুখ বেরিয়ে পড়ল। সেখানে নাকেশ্বরী বলে একটা বিকটাকার ভূতিনী দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখেই সে খল্-খল্ করে বিশ্রী ভাবে হাসতে লাগল। স্কাল বলল, 'চোপ্!' নাকেশ্বরী চুপ করল।

সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূতরা খেতুকে চমৎকার একটা প্রাসাদে নিয়ে গেল। দামী-দামী দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে প্রাসাদটা ঠাসা ছিল। তাই দেখে খেতু তাজ্জব বনে গেল।

স্কাল বলল, 'এ জায়গার ইতিহাস শোন। এক হাজার বছর আগে আমরা এখানে রাজত্ব করতাম। সারা জীবন শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ লুটপাট করে কাটিয়েছিলাম। কখনো কোনো দান-ধ্যান ধর্ম-কর্মও করিনি। দুজনার কারো ছেলেপুলেও ছিল না। তাতে আমাদের কোনো দুঃখও ছিল না, কারণ ছেলেপুলের বড় বদভ্যাস বাজে খরচ করে টাকা নষ্ট করা। আমরা খরচও করতাম না। ধনরত্নগুলো নাড়াচাড়া করতাম, গুণতাম। তাতেই আনন্দ পেতাম। আমরা মরে গেলে পাছে কেউ ধনদৌলতগুলো নিয়ে নেয়, তাই যক্ করে নাকেশ্বরী ভূতিনীকে পাহারায় বসিয়ে দিলাম।

তাকে বলা আছে এক হাজার বছর কাউকে এ ধনরত্ন ছুঁতে দেবে না। কেউ ছুঁলে তাকে তক্ষুণি মেরে ফেলবে। হাজার বছর হয়ে গেলে, যার কপালে ধন আছে, সে-ই পাবে। নাকেশ্বরীরো ছুটি হয়ে যাবে। হাজার বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র এক বছর বাকি আছে। তারপর এই সব ধনরত্ন খেতুর হবে। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কিছুতে হাত দিলে, নাকেশ্বরী তাকে খেয়ে ফেলবে।

গল্পের শেষে স্কাল বলল, 'যক্ বসাবার অল্প দিন পরেই যুদ্ধে আমরা মরে গেলাম। জ্যান্ত অবস্থায় আমরা একটা আস্ত মানুষ ছিলাম। শত্তুরে আমাদের তলোয়ারের কোপে দু-টুকরো করাতে, দুটো ভূত হয়ে গেছি। নাকেশ্বরী আর এক বছর এ সব আগলাবে। গত পৌষ মাসে ঘ্যাঁ-ঘোঁ ভূতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। হাজার বছর পুরলেই সে-ও শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। তুমিও সব কিছুর মালিক হবে।'

এ কাহিনী শুনে খেতুর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে বলল, 'আমি আপনাদের সব কথাই মেনে চলব। কিন্তু এখন এমন একটা উপায় করুন, যাতে এখান থেকে কিছু ধন আমি নিতে পারি। বড়ই দরকার আমার। না পেলে হয়তো বাঁচবই না।'

এ-কথা শুনে স্কাল আর স্কেলিটন তাকে ডেকে আবার বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছোট একটা ওষুধের গাছ দেখিয়ে বলল, 'এর শিকড়টি তুলে নিয়ে, ওর পাশের ঐ গাছের আঠা দিয়ে মাথার চুলের সঙ্গে বেশ করে জুড়ে দাও। তারপর তোমার দরকার মতো টাকা-কড়ি নিলে নাকেশ্বরী কিছু বলবে না। তবে বাইরে গেলেই মুস্কিল। তখন শিকড় কাজ করবে না। কিন্তু শিকড়ের গুণে তুমি যে কোনো জানোয়ারের রূপ ধরে বাইরে যেতে পারবে! বাঘ হল নাকেশ্বরীর

ইষ্টদেবতা। তুমি বাঘের রূপ ধরে বাইরে যাওয়া-আসা করলে, ও তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। কাজেই সাবধান, এই এক বছর ধরে শিকড় যেন মাথায় থাকে। নাকেশ্বরী বেচারিরো অনেক দুঃখ-কষ্ট গেছে ; সে-ও ছুটি পেলে বেঁচে যাবে। ঘ্যাঁ-ঘোঁর সঙ্গে বিয়ে তো একবার এক রকম ভেঙেই গেছিল। দুষ্টু লোকেরা রটিয়ে দিয়েছিল ঘ্যাঁ-ঘোঁ দেখতে মজবুত হলেও রোজ সন্ধ্যেবেলায় জ্বর হয়, খুশ-খুশ কাশি হয়, কাশির সঙ্গে আলকাতরা ওঠে! মনের দুঃখে ঘ্যাঁ-ঘোঁ অনেক দিন একটা কুয়োর তলায় বসে ছিল। শেষ পর্যন্ত বিয়ে যে হল, সেই যথেষ্ট।'

খেতু নাকেশ্বরীর দুঃখের কথা শুনে বলল, 'কাশির সঙ্গে আলকাতরা উঠলে বিয়ে ভেঙে যাবে কেন?' 'বা:, তা যাবে না? রক্ত উঠলে মানুষ মরে, আর আলকাতরা উঠলে ভূত মরবে না?' খেতু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ভূত মরলে কি হয়?' স্কাল বিরক্ত হল, 'তাও জান না? ভূত মলে মার্বেল হবে না তো কি হবে?' খেতু বলল, 'বাবা! ঐ মার্বেল নিয়ে খেলা তো বড় বিপজ্জনক!' স্কাল বলল, 'মরা ভূতের মার্বেল নিয়ে খেলা করা আবার বিপজ্জনক কিসের? তবে হ্যাঁ, জ্যান্ত ভূত নিয়ে খেলতে চেষ্টা না করাই ভালো। আচ্ছা, সব কথা শুনলে, সেই মতো কাজ কর। এবার আমরা চললাম।' এই বলে তারা চলে গেল।

* * *



॥ ১৬ ॥

নিজের সব অভিজ্ঞতার কথা বলে, খেতু কঙ্কাবতীকে আবার বলল, 'এ সব কথা তোমাকে আগে বললে আর এ বিপদ হত না। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন পোড়া শিকড়ের গন্ধ যেই নাকেশ্বরীর নাকে যাবে, সে অমনি আমাকে মারতে ছুটে আসবে। এখানকার জিনিস আমি যদি না ছুঁতাম তাহলে সে আমার কিছু করতে পারত না।' কঙ্কাবতী বলল, 'তাহলে আমিও যাই, গিয়ে টাকাকড়ি নিই। নাকেশ্বরী দুজনকেই একসঙ্গে খেয়ে ফেলুক।'

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকারে বাড়িঘর কাঁপতে লাগল ; চারদিক অন্ধকার হয়ে এল ; দরজা-জানলা ঝনাৎ ঝনাৎ করে পড়তে লাগল। খেতু বলল, 'ঐ নাকেশ্বরী আসছে!' বিশ্রী গন্ধে ঘর ভরে গেল। কঙ্কাবতী ছুটে গিয়ে দরজাটা এঁটে বন্ধ করে, পাল্লাটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। প্রদীপ নিবল না বটে, কিন্তু চারদিক অন্ধকারে মুড়ে গেল। অদ্ভুত শব্দে ঘর ভরে গেল। তারপর শব্দ বন্ধ হল, গন্ধ দূর হল, অন্ধকার মুছে গেল, প্রদীপ আবার উজ্জ্বল হল।

কঙ্কাবতী দেখল চোখ বুজে অজ্ঞান হয়ে খেতু পড়ে আছে। তার পাশে বিকট চেহারার নাকেশ্বরী দাঁড়িয়ে আছে। কঙ্কাবতী তার পা ধরে বলল, 'ওগো, তুমি আমার স্বামীকে মেরো না। আমি বড় দুঃখে দিন কাটিয়েছি ; স্বামী ছাড়া কিছু চাই না। তুমি দয়া কর।'

কিন্তু ভূতিনীর দয়া হল না। সে বাঁ হাত তুলে বলল, 'দূর!

দূর!' অনেক কান্নাকাটি কাকুতি-মিনতি করেও যখন ফল হল না, কঙ্কাবতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বটে! তোমার ঐ এক কথা, দূর! দূর! আমার স্বামীকেও দেবে না, আমাকেও খাবে না? দেখছি তোমারি একদিন কি আমারি একদিন!' এই বলে সে নাকেশ্বরীর দিকে তেড়ে গেল। নাকেশ্বরী খালি ফোঁশ করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। কঙ্কাবতী দরজার সামনে ছিটকে পড়ল।



সঙ্গে সঙ্গে উঠে আবার তেড়ে এল কঙ্কাবতী। আরেক ফুঁয়ে প্রাসাদের বাইরে। তখন কঙ্কাবতী কাতর ভাবে বলতে লাগল, 'আমাকে আমার স্বামীর কাছে থাকতে দাও। আমি আর কিছুই

চাই না।' কিন্তু নাকেশ্বরী আরেকটি নিশ্বাস ফেলতেই কঙ্কাবতী উড়ে গিয়ে পাহাড়ের বাইরে, বনের মধ্যে পড়ল।

চুপ করে পড়েই রইল কঙ্কাবতী। তার সারা গা ছড়ে রক্ত পড়ছিল। উঠে যে দাঁড়াবে, তার জোর পাচ্ছিল না। উঠেই বা কি লাভ? খেতুর কাছে তো আর যাবার জো নেই। অনেকক্ষণ পড়ে পড়ে কাঁদবার পর মনে হল, 'এতে কোনো লাভ নেই। কত রকম ওষুধ আছে; গুণীরা কত রকম মন্ত্র জানেন; আমার স্বামীর জন্য কেউ কি কিছু করতে পারবেন না?' কঙ্কাবতী উঠে চোখ মুছে, বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। সে মন ঠিক করে ফেলেছিল। হয় খেতুকে বাঁচাবে, নয় নিজেও লড়ে মরবে। একটা ভূতিনীর কাছে কখনোই হার মানবে না।

তাহলে ওষুধ করবার লোক দরকার। সেজন্য গ্রাম-গঞ্জে যেতে হবে। বৈদ্য কি গুণীন্ তো আর জনশূন্য বনে বসে থাকেন না। কঙ্কাবতী পা চালিয়ে এগিয়ে গেল, অথচ তখনো রাত কাটেনি, সূর্য ওঠেনি, দিক ঠিক করার উপায় নেই। খেতু বলেছিল সূর্যকে ডান দিকে রেখে উত্তরমুখো যেতে হয়। এখন আন্দাজে যেতে হবে। তাই যাবে কঙ্কাবতী। খানাখন্দ, পাহাড়, জঙ্গল সব পার হয়ে চলল সে। পথ শুধোবার একটা লোক পেল না; কারো একটা চালাঘরও চোখে পড়ল না।

হঠাৎ দেখে এক অপূর্ব দৃশ্য। সামনে দিয়ে কোট পেণ্টেলুন পরে, হ্যাট্ মাথায়, খালি পায়ে বড়সড় একটা ব্যাঙ ঘটম্যাক্ ঘটম্যাক্ করে চলেছে। অতি অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে, তবু তাকেই কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করল, 'ও ব্যাঙমশাই, গ্রামে যাবার পথ কোন দিকে?'

ব্যাঙ বললেন, 'হিট্ মিট্ ফ্যাট্!'

কঙ্কাবতী অবাক্ হয়ে আবার বলল, 'ও ব্যাঙ মশাই, আপনি নিশ্চয় জানেন কোন দিকে গ্রাম?'



ব্যাঙ চটে বললেন, 'হিশ্ ফিশ্ ড্যাম!'

তখন কঙ্কাবতী মরিয়া হয়ে বলল, 'ও ব্যাঙ মশাই, আমি একটা মুখ্যু মেয়ে, ইংরিজি বুঝি না। দয়া করে বাংলায় বলুন, তবেই বুঝব।'

ব্যাঙ আসলে বড় ফ্যাশানেব্‌ল্। সেকালের ফ্যাশানেব্‌ল্ লোকরা দিশী নেটিবদের মতো বাংলা বলতে লজ্জা পেতেন। কিন্তু কঙ্কাবতীর মিষ্টি কথা শুনে ব্যাঙের ভারি দয়া হল। তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন এই নির্জন বনে কোনো ফ্যাশানেব্‌ল্ লোকের আসবার সম্ভাবনা নেই। তাই শেষ পর্যন্ত বললেন, 'এ্যা, কোথাকার ছুঁড়ি রে তুই যে সায়েবকে খালি ব্যাঙমশাই ব্যাঙমশাই কচ্ছিস্? আমার হ্যাট কোট প্যাণ্টেলুন দেখতে পাচ্ছিস্ না? আমি কি নেটিব? সায়েব বলতে পারিস্ না?'

নিজের ভুল বুঝে লজ্জা পেয়ে কঙ্কাবতী বলল, 'আমি মুখ্যুস্থখ্যু ছেলেমানুষ, দোষ করে ফেলেছি বলে ক্ষমা চাইছি। এবার দয়া করে গ্রামের পথটা বলে দিন।' ব্যাঙ তবু খুশি হলেন না, 'ও আবার কেমন ধারা কথা? ব্যাঙ ব্যাঙ কচ্ছিস্ কেন? মিস্টার গামিশ বলতে পারিস্ না?'

'বেশ, না হয় তাই বলছি। ও মিস্টার গামিশ আমাকে গ্রামে যাবার পথটা বলে দিন। আমার নাম কঙ্কাবতী।'

এবার ব্যাঙের রাগ পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'বেশ, বেশ, লঙ্কাবতী। এবার আমার সায়েব হওয়ার ইতিহাস শোন্।' এই বলে লম্বা এক গল্প ফাঁদলেন। এক দিন নাকি বনের মধ্যে বসে ছিলেন, এমন সময় একটা হাতি তাঁকে ডিঙিয়ে গেল। এতটুকু ভয় নেই, কিচ্ছু না! একটু পাশ কাটিয়েও গেল না। তাই ব্যাঙ তাকে বললেন, 'উট-কপালী, চিরুণদাঁতী, বড় যে ডিঙ্গুলি মোরে?' এই অবধি বলেই ব্যাঙ বললেন 'কেমন বললাম বল্ দিকিনি, লঙ্কাবতী?'

কঙ্কাবতী ব্যাকুল হয়ে বলল, 'খাসা বলেছেন। কিন্তু গ্রামের পথটা তো বললেন না?'

ব্যাঙ বড্ড গোপ্পে। তিনি বললেন 'তোর অত তাড়া কিসের র‍্যা ? আগে আমার কথা শোন্ তো। তা ভয় পাওয়া দূরের কথা, হাতির এমনি আস্পর্ধা যে বলল—থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাব্ড়ানাকী, ধর্মে রেখেছে তোরে। আচ্ছা, তুমিই বল লঙ্কাবতী, আমার কি থ্যাবড়া নাক ?'

কঙ্কাবতী বলল, 'না, মোটেই নয়। আমার নাম কঙ্কাবতী। এবার পথ বলে দিন।'

* * *



॥ ১২ ॥

ব্যাঙ অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন। তারপর পথের কথা না বলে, বললেন 'হয়তো আমাকে অপমান করার জন্য বলেনি, মিল দেবার জন্য বলেছিল। বেড়ে কবিতা হয়েছে কিন্তু। আচ্ছা খবরের কাগজে ছাপানো যায় না? সেই থেকে আমার মনে হল সায়েব না হলে কেউ সম্মান দেয় না। তাই সায়েব সেজেছি। খালি জুতোটা এখনো কেনা হয় নি। তুই-ই বল্, আমাকে সায়েবের মতো দেখাচ্ছে কি না। এবার রেলগাড়িতে সায়েবদের থার্ড কেলাস্ কামরায় উঠে, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব। সায়েব দেখে ভয়ে কেউ উঠবে না। সে বেশ হবে। কি বলিস্ কঙ্কাবতী?'

কঙ্কাবতী বলল, 'খুব ভালো হবে। এবার পথ বলে দিন। না জানেন তো তাই বলুন, আমি চলে যাই।'

ব্যাঙ চমকে উঠে বললেন 'এ্যাঁ, কি বললি?' কঙ্কাবতী বলল, 'বললাম কোন পথে গ্রামে যাব? গ্রাম কত দূরে? সেখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

ব্যাঙ বলল, 'তার আগে আমার একটা হিসাব কষে দে তো দেখি। হিসাবটা মেলাতে না পেরে, আমি বড়ই কষ্টে আছি। শোন তবে।

আমার একটা আধুলি ছিল। সেটা একজন ধার নিল। তার

সঙ্গে কথা হল যে আমার কাছে যতটা ধার বাকি থাকবে, রোজ তার অর্ধেকটা শোধ করবে। তা হলে হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ— প্রথম দিন সে চার আনা শোধ করবে, চার আনা বাকি থাকবে। দ্বিতীয় দিন দুই আনা শোধ করবে, দুই আনা বাকি থাকবে। তৃতীয় দিন এক আনা শোধ করবে, এক আনা বাকি থাকবে। এক আনা হল চার পয়সা। চতুর্থ দিন তার দু পয়সা শোধ করবে, দু পয়সা বাকি থাকবে। পঞ্চম দিন এক পয়সা শোধ করবে এক পয়সা বাকি থাকবে।

এক পয়সা হল গিয়ে পাঁচ গণ্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। তার পর দিন দশ কড়া শোধ করবে ; তার পর দিন পাঁচ কড়া ; তার পর দিন আড়াই কড়া ; তার পর দিন সোয়া এক কড়া ; তার পর দিন তার অর্ধেক ; তার পর দিন তার অর্ধেক ; তার পর দিন তার পর দিন তার অর্ধেক—' ক্রমে ব্যাঙের গলার স্বরটা কাঁদুনে কাঁদুনে হয়ে এল—'কিন্তু রোজ যদি অর্ধেকটা বাকি থাকে, তাহলে সবটা কি করে শোধ হবে বল্‌ না! চিরকাল ধরে অর্ধেকটা করে দিলেও যে অন্য অর্ধেকটা বাকি থেকে যাবে! ও বাবা গো! তা হলে তো এ জন্মে আমার আধুলীটে ফেরৎ পাব না গো! আমার যে ঐটে ছাড়া আর কিছু নেই গো! লোকরা বড় নিষ্ঠুর গো! আমার দুঃখ কেউ বোঝে না! ধার তো শোধ হবেই না, তার উপর যে ধার শোধ হবার নয়, তাকে টিটকিরি দিয়ে বলে ব্যাঙের আধুলী! এ কি কষ্টের কথা গো!'

তারপর একটু দম নিয়ে, আবার কাঁদো কাঁদো গলায় ব্যাঙ বলতে লাগলেন, 'ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে মন ভালো করব, তা আর হল না। তুই বরং ঐ দিক দিয়ে চলে যা, এক সময়ে

গ্রামে পৌঁছে যাবি। কিন্তু সে অনেক দূরে, অনেক সময় লাগবে। আজ রাতের মধ্যে পৌঁছতে পারবি না। তার উপর লাফিয়ে না চলে তোদের ঐ গুটি গুটি চলা! দেখে হাসি পায়! কিন্তু তুই বড় ভালো মেয়ে গো। লেখাপড়া শিখেও দেমাক বাড়েনি। এদিকে আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল গো! ওগো মাগো! আমার কি হবে গো!'

*   *   *



॥ ১৮ ॥

ব্যাঙের কথাই ঠিক। সূর্যকে ডান হাতে রেখে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলেও কঙ্কাবতী কোনো গ্রাম দেখতে পেল না। বনের মধ্যেই সন্ধ্যা নামল। মনে নিদারুণ দুর্ভাবনা, শরীর আর চলে না। কঙ্কাবতী শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের উপর বসে পড়ে কাঁদতে লাগল। এমন সময় কানের কাছে মিষ্টি গলায় কে জানি বলল, 'আহা, তুমি কাদের মেয়ে গো?' কাউকে দেখতে না পেয়ে গোড়ায় কঙ্কাবতী হকচকিয়ে গেছিল। তারপর বুঝল কানের কাছে উড়ে উড়ে একটা মশা কথা বলছে। ভালো করে তাকিয়ে মনে হল এ হল মশাদের ছেলেমানুষ একটি মেয়ে।

কঙ্কাবতী বলল, 'আমি মানুষদের মেয়ে কঙ্কাবতী।' মশা মেয়ে কখনো মানুষ দেখেনি। সে আশ্চর্য হয়ে বলল,

'মানুষদের মেয়ে? সেই মানুষদের, যাদের রক্ত বাবা নিয়ে আসেন আর আমরা খাই?' এখানে বলে রাখা ভালো যে আজকালকার জীববিজ্ঞানীরা বলেন যে বাবারা নয়, মশাদের মা-রাই লোকের বাড়ি গিয়ে রক্ত শুষে নেয়। সে যাক গে, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গল্পের কি? কঙ্কাবতী মানুষদের মেয়ে শুনে মশার মেয়ে কৌতূহল রাখার জায়গা পায় না। 'দেখি, দেখি, মানুষ কেমন দেখতে হয়। আমরা ভদ্রবাড়ির মশা কি না তাই বাইরে বেরোই না। বেরোই না বলে মানুষ দূরে থাকুক, যে-গাছে মানুষ গজায়, তা-ও দেখিনি।'

কঙ্কাবতীকে ভালো করে দেখেশুনে মশার মেয়ে বলল, 'তুমি বোধ হয় ধাড়ি মানুষ নও, বাচ্চাটাচ্চা হবে।' কঙ্কাবতীর মশামেয়েকে ভালো লাগল। সে বলল, 'ধাড়ি না হলেও, খুব ছোটও নই। আমার নাম কঙ্কাবতী।' মশামেয়ে বলল, 'ওমা, কি মজা! আমার নাম রক্তবতী। কেমন মিলে গেছে দেখলে, ভাই? তোমাকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে। এসো আমরা সই পাতাই।

কঙ্কাবতীর মনে বড় দুঃখ। স্বামীকে এখন-যায়, তখন-যায় দেখে এসেছে। সে বলল, 'ভাই, আমি বড় দুঃখিনী। আমার স্বামীকে বড়ই বিপদের মধ্যে ফেলে এসেছি। এ কি আমার আমোদ আহ্লাদ করবার সময়?'

রক্তবতী বলল, 'তোমার স্বামী বিপদে পড়েছেন তো কি হয়েছে? এখন আমরা সই পাতাই। তুমি আমার পচা-জল হও, আমি তোমার পচা-জল হই। আমি পচা-জল বড় ভালোবাসি। তারপর বাবা বাড়ি ফিরলে তাঁকে সব কথা বললে, তিনি নিশ্চয় একটা উপায় করে দেবেন। কি বল?'

কঙ্কাবতী দেখল বুড়ো ব্যাঙটাও যেমনি অবুঝ, এই কচি মশাটিও তাই। এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। কাজেই সে রক্তবতীর সঙ্গে পচাজল পাতাতে আর আপত্তি করল না। রাজি হল বটে, কিন্তু সর্বদা খেতুর কথা মনে হয় আর চোখ দিয়ে জল পড়ে। তাই দেখে তার পচাজলের বড়ই দুঃখ হয়।

সে যতই কঙ্কাবতীকে দেখে ততই তার বিস্ময় বাড়ে। 'ও মা, ভাই পচাজল, তোমার দেখছি উপরের ঠ্যাঙ দুটো আর তলার ঠ্যাঙ দুটো আছে। মধ্যিখানের দুটো ছিঁড়ে গেছে বুঝি? ও মা! তাই বোধ হয় কাঁদছ। আমি বলি কি না হয়েছে। ও ঠ্যাঙ আবার

গজাবে দেখো। আমারো একটা ছিঁড়ে গেছল, সে আবার গজিয়েছে। তাই বলে কেঁদো না।'

কঙ্কাবতী বলল, 'না ভাই পচাজল, আমাদের মধ্যিখানে পা থাকে না। আমি অন্য কারণে কাঁদছি।' পচাজল হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'কি সর্বনাশ! তোমার নাকটা কোথায় গেল? খাবে কি দিয়ে?' কঙ্কাবতী আবার বুঝিয়ে বলল, 'আমাদের নাক ছোটই হয়, আমরা মুখ দিয়ে খাই।' শুনে পচাজলের কি দুঃখ, 'ছোট নাক যে বিশ্রী দেখতে! বাবা এলে বলব তোমার নাকটা টেনে বড় করে দিতে। তাহলে তুমিও আমার মতো সুন্দরী হয়ে যাবে।'

কঙ্কাবতীর মন আরো খারাপ হয়ে গেল। কোথায় তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়ে বদ্যি এনে খেতুকে সারিয়ে তুলবে। তা নয়। একবার ব্যাঙ সায়েবের, আবার পচাজলের পাল্লায় পড়ে, কেবলি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

পচাজল তাদের ঘরের কথা বলতে লাগল, 'ঐ যে কোঁকড়ানো পাতা দেখছ, ওর মধ্যে আমরা থাকি। আমার তিনটি মা। বাবা চরতে গেছেন, একটু বাদেই আসবেন। যাই মা-দের তোমার কথা বলে আসি।' এই বলে মশা-মেয়ে উড়ে গেল। আবার একটু পরেই ফিরে এসে কঙ্কাবতীকে মায়ের কাছে নিয়ে গেল।

রক্তবতীর মা-র বয়স বেশি না। তিনি কোঁকড়ানো পাতার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আমার রক্তবতীর সঙ্গে তুমি পচাজল পাতিয়েছ শুনে খুব খুশি হয়েছি। সে আমাদের বড় আদরের মেয়ে। কর্তার এত অবস্থা ভালো, কিন্তু ছেলেপুলে বলতে ঐ একটি মেয়ে। তোমার স্বামীর কথা সে কি যেন বলছিল। তার কি হয়েছে?'

কঙ্কাবতী আবার কেঁদে ফেলল, 'আমার স্বামীকে নাকেশ্বরী

ভূতিনীতে পেয়েছে। তাঁকে যদি ভালো করতে না পারি, তা হলে আমারো বাঁচতে ইচ্ছা করে না। তাই আমি গ্রামের পথ খুঁজছি। গ্রাম থেকে বদ্যি কিম্বা ওঝা নিয়ে যাব। তিনি ওষুধ দিয়ে আমার স্বামীকে বাঁচাবেন। আমার আর বসবার সময় নেই। এখনি রওনা হতে পারলে ভালো হয়। তোমরা আমাকে পথ বলে দিতে পার ?'

মশানী বলল, 'আমরা কি করে পথ জানব, মা ? বড় ঘরের বৌ তো আর পথে বেরোয় না। কর্তা বাড়ি এলেই তাঁকে বলব। তিনি নিশ্চয় একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেবেন।'

ইনি হলেন রক্তবতীর মা, ছোটরানী। এবার এঁর পাশ দিয়ে বড়রানীও মুখ বাড়ালেন, 'ওমা, এই মানুষছানাটাকে আমি পুষব। নিজের ছেলেপুলে নেই, তাই একটা জানোয়ার পুষবার বড় শখ হয়েছে। এটাকে খাবটাব না, যত্ন করে কাছে রাখব।'

এই সময় মেজ-মশারানীও মুণ্ডু বের করে বললেন, 'ওমা! কি বলে! খাবে না-ই বা কেন ? মানুষরা যে গোরু পোষে, তার দুধ খায় না ? এটাকে পুষলে, ঘরেই তাজা রক্ত পাওয়া যাবে। কর্তা বেচারিকে কষ্ট করে দূর থেকে নিয়ে আসতে হবে না।'

ছোটরানী চটে গেলেন, আহা, রক্তবতী কুড়িয়ে পেয়েছে। মানুষটা তার জিনিস। তুমি কথা বলবার কে ? ছোট মেয়ের হাত থেকে তার শখের জিনিস কেড়ে নিতে চাও, তোমাদের আক্কেল তো বেশ! আজ কর্তা এলেই তাঁকে বলব, এ সংসারে আর আমি থাকব না। আমাকে এক্ষুণি বাপের বাড়ি পাঠানো হক। বাপ ভাই বেঁচে থাকুক। আমার কিসের অভাব!'

বড় রানী বিরক্ত হলেন, 'কি জ্বালা! এর যে বাপ ভাইয়ের গর্বে মাটিতে পা পড়ে না!' তিন রানীতে বেশ খানিকটা বচসা হয়ে

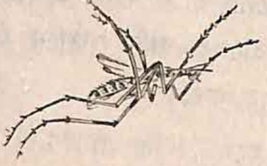
গেল। কিন্তু মশার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে, সকলেরি এত ভাবনা হতে লাগল যে ঝগড়া থেমেও গেল। কঙ্কাবতীরো বড়ই দুশ্চিন্তা, কারণ কর্তা এলে, তার যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তাঁর এত দেরি হচ্ছে কেন?'

ছোট মশারানী বললেন, 'বাঁশ কাটছেন, ভার বাঁধছেন, রক্ত নিয়ে আসছেন পারা।' তার মানে এত রক্ত সংগ্রহ করেছেন যে শুঁড়ে ধরছে না, তাই বাঁশের চোঙায় ভরে আনছেন।

একটু পরে আরেকবার ও কথা জিজ্ঞাসা করতেই মেজরানী বললেন, 'তুষের ধোঁ, ফুলের বাতাস, কোণ নিয়েছেন পারা।' তার মানে রক্ত নিতে কারো বাড়ি ঢুকেছিলেন। তারাও তুষ জ্বেলে, হাওয়া করে ঘরদোর ধোঁয়ায় ভরে দিয়েছে। পারা তাই কোণায় লুকিয়ে আছেন। ধোঁয়া গেলে বাড়ি ফিরবেন।

তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে বড়রানী বললেন, 'কটাস্ কামড়, চটাস্ চাপড়, মরে গেছেন পারা!' এর মানে আর কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এমন অলুক্ষুণে কথা শুনে আদুরে ছোটরানী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝগড়া লাগল, রক্তবতী তারস্বরে কান্না জুড়ল। সেই গোলমালের মধ্যে পারা বাড়ি ফিরলেন।

*



॥ ১৯ ॥

ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে, রোজ রোজ এই রকম ঝগড়াঝাটি শুনতে কার ভালো লাগে? মশারো গা জ্বলে গেল। তিনি বললেন কোথায় এক আফিংখোরের রক্ত খেয়ে প্রাণটা আরেকটু হলেই গেছিল। ভাগ্যিস রক্তটা বিটকেল তেতো ছিল, তাই থু থু করে ফেলে দিয়ে, ভালো করে কুলকুচি করেছিলেন, নইলে হয়ে গেছিল আর কি! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিসের জন্য প্রাণ রাখা? নিত্যি এই খ্যাচাখেঁচি শোনার চেয়ে আত্মহত্যা করাও ভালো!

এই সব বলে টলে গা থেকে রাগ ঝেড়ে ফেলে মশা ঠাণ্ডা হয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তবতী তাঁর কোলে চেপে বসে তার পচাজলের কথা বলল। তার মা-ও অমনি ইনিয়ে বিনিয়ে অন্য রানীদের নামে নালিশ করতে লাগলেন। কর্তা সেদিকে কান না দিয়ে, রক্তবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই মানুষ মেয়েটা কোথায়?'

তখন রক্তবতী তাঁকে কঙ্কাবতীর কাছে নিয়ে গেল। কঙ্কাবতী তাঁকে নমস্কার করে, হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। মশারা দুজন দুটো ঘাসের ডগায় বসল। তারপর কঙ্কাবতী বলল,

'আমি বড় দুঃখিনী, বনে বনে বদ্যির সন্ধানে ঘুরছি। আমার স্বামীকে নাকেশ্বরী ভূতিনীতে পেয়েছে। আপনি তাঁকে উদ্ধার করে দিন। আমি আপনার শরণ নিলাম।'

মশা বললেন, 'তুমি কোন মশার সম্পত্তি?' এ-কথা শুনে কঙ্কাবতী তো অবাক! তখন মশা বুঝিয়ে বললেন, মশারা কে কার রক্ত খাবে ঠিক করে মানুষদের ভাগাভাগি করে নেয়। এখন কঙ্কাবতী

কোন মশার সম্পত্তি সেটা জানা দরকার। নইলে পরের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার তো পারার থাকতে পারে না। কিন্তু



রক্তবতীর পচাজলকে তার মশা প্রভুর কাছ থেকে কিনে নিতেও কোনো বাধা নেই। কাজেই সেই প্রভুর নাম জানা দরকার।

কঙ্কাবতী তো থ'! তার যে আবার একটা মশাপ্রভু থাকতে

পারে, এ-কথা সে কখনো সন্দেহও করেনি। কিন্তু পারা সে-কথা বিশ্বাস করলেন না, উল্টে তাকে যা নয় তাই বলে বকতে লাগলেন। তাতে দুঃখিনী কঙ্কাবতী কেঁদে ভাসাল। রক্তবতী ওকে বলেছিল পারার রাগ যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি ঝপ্ করে নিবেও যায়। এবার ঠিক তাই হল। কঙ্কাবতীর কান্না দেখে পারার বড়ই কষ্ট হল। তিনি লজ্জা পেয়ে বললেন, 'এটা এমন কথায় কথায় চ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেন? সব কথা খুলে বলবে তো।'

রক্তবতী বলল, 'একে মানুষরা কত বোকা হয় সে তো সব মশাই জানে। তার উপর আমার পচাজল ছেলেমানুষ আর বড়ই দুঃখ-কষ্টে আছে।' মশা সে কথা মানলেন। তাহলে তো এর কাছে কোনো খবরই পাওয়া যাবে না। অন্য উপায় দেখতে হবে। যতটা পারেন গলা নরম করে বললেন, 'হ্যাঁগো মেয়ে, নিদেন তোমাদের বাড়িটা কোন গ্রামে তা তো বলতে পারবে?'

কঙ্কাবতী বলল, 'কুসুমঘাটিতে।' অমনি পারার দূতরা কুসুমঘাটি ছুটল। সেখানে তদন্ত করে জানল যে আকাশমুখ বলে শালগাছবাসী, গজমুণ্ড, বৃহৎমুণ্ড আর বিকৃতমুণ্ড বলে তিনজন মশা কঙ্কাবতীর মালিক। তাঁদের কাছে সব কথা খুলে বলাতে সহৃদয় মশারা তিনজন তাদের সঙ্গে রক্তবতীর বাবার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। পারার ভালো নাম দীর্ঘশুণ্ড। মালিকদের সঙ্গে দর-দস্তুর করে, শেষ পর্যন্ত তিন ছটাক মানুষের রক্ত দাম দিয়ে তিনি কঙ্কাবতীকে কিনে নিলেন। সে এখন রক্তবতীদের সম্পত্তি হল।

দীর্ঘশুণ্ড মেয়েকে বললেন, 'এবার একে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পার, কেউ কিছু বলতে পারবে না।' রক্তবতী বলল, 'ও আমার প্রাণের বন্ধু, আমার আদরের পচাজল। ওর স্বামীকে ভূতিনীতে পেয়েছে বলে ও কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। ও যাতে ওর স্বামীকে আবার ফিরে পায়, তার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।' দীর্ঘশুণ্ডেরো দয়ার শরীর ছিল। তিনি কঙ্কাবতীকে ডেকে, সব কথা

শুনে বললেন, 'আমার মেয়ের পচাজল আমাদেরো কিছু ফেলনা নয়। তাছাড়া আমি তোমাকে মেয়ের মতোই ভালোবাসি। আমার রাজ্যে খর্বুর মহারাজ থাকেন। তার মতো বড় বৈদ্য আর গুণীন্ ভূ-ভারতে নেই। বৃষ্টি না পড়লে ওষুধ দিয়ে তিনি আকাশ ফুটো করে বৃষ্টি নামান। মাঝপথে শিলাবৃষ্টি বন্ধ করেন, পাছে শস্যের ক্ষতি হয়। ভূতরা তাঁকে দেখলে ভয়ে পালায়।'

এ-কথা শুনে কঙ্কাবতী অধীর হয়ে বলল, 'তাহলে এখনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।' মশা বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে, তুমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর, অনেক ধকল সয়েছ। আমি আমার ছোট ভাইকে ডেকে পাঠাই। তার পিঠে চড়ে যাওয়া যাবে। খর্বুরের বাড়ি অনেক দূরে।'

ভাইয়ের কাছে অনুচর গেল; ভাইও এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই রানীরা হাতিঠাকুরপো! বলে ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগলেন। কঙ্কাবতী অবাক হয়ে দেখল মশার ছোট ভাইটি একটি সত্যিকার হাতি। হাতিকে কঙ্কাবতীর বিপদের কথা খুলে বলা হল। দীর্ঘশুণ্ডের তখনি রওনা হয়ে যাবার ইচ্ছা। হাতিঠাকুরপোও তৈরি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে পচাজলের কাছ থেকে কঙ্কাবতী বিদায় নিল। শুধু তারি জন্য এই চেষ্টা সম্ভব হল।

হাতির পিঠে মশার সঙ্গে কঙ্কাবতী উঠল। সারা রাত হাতি হেঁটে চললেন; ভোরে তাঁরা খর্বুরের বাড়িতে পৌঁছলেন।

* * *



॥ ২০ ॥

খুব ভোরে খর্বুরের বাড়ি পেঁছে কঙ্কাবতী দেখল খর্বুর হাঁড়িমুখ করে দোর-গোড়ায় বসে আছেন। এদিকে আকাশে প্রতিপদের চাঁদের হাসি মুখটা তখনো দেখা যাচ্ছে। খর্বুরের মন-মেজাজ খারাপ ছিল; তাই চাঁদের হাসিমুখ দেখে তাঁর পিত্তি জ্বলে গেছিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'ও ব্যাটাকে আমি যদি তুক্-তাক্ মন্ত্রতন্ত্র করে আচ্ছাসে জব্দ না করি তো কি বলেছি!'

এই সময় কঙ্কাবতীদের দেখে খর্বুর ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় না এসে সকালে এলেন যে? বাড়িতে বুঝি কুটুম্বরা খাবেন, তাই অনেক রক্ত দরকার? বোঝা বইবার জন্য ভাইকেও সঙ্গে এনেছেন দেখছি।'

মশা বললেন, 'না, না, ও-সব নয়। আজ অন্য কাজে এসেছি। কিন্তু তোমার এমন হাঁড়িমুখ কেন? খাবেদাবে, ফুর্তি করবে— তবে সে না মন ভালো হবে, শরীরে রক্ত বাড়বে। নইলে আমি পরিবার প্রতিপালন করব কি করে?'

খর্বুর একজন মানুষ। তিনি বললেন, 'আর বলবেন না, মশাই। স্ত্রীর জ্বালায় আমার এই অবস্থা।' 'কেন, সে কি করেছে?'

খর্বুর বললেন, 'করেছে না। করে। রোজ করে। রোজ আমাদের দুজনার ঝগড়া হয়। মারামারিও হয়। সে মাথায় সাত হাত উঁচু, আমি মোটে তিন হাত। কাজেই মারামারির ফলটা বুঝতেই পারছেন। নিজের পায়ের নাগ্‌রা খুলে সে চটাপট আমার

মাথায় বসায়। অথচ খামচে-খুমচেও আমি তার মাথার নাগাল পাই না। হাঁড়িমুখ কি সাধে।'

মশা হেসে বললেন, 'এই কথা! আমি এক্ষুণি এর প্রতিকার করছি।' এই বলে কঙ্কাবতীকে নিয়ে হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়ে, খর্বুরকে বললেন, 'এবার তুমি ভায়ার মাথায় চড়ে বেয়াড়া বৌয়ের মাথায় আচ্ছা করে খড়মপেটা কর দিকিনি।'

তখন খর্বুরকে পায় কে! হাতির মাথায় চড়ে তক্ষুণি তিনি বাড়ির ভিতরের উঠোনে ঢুকে, ইচ্ছা করে বৌকে বকাবকি করতে লাগলেন। বৌও রেগে মেগে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসতেই, খর্বুর হাতির মাথায় বসে বসে নিজের পায়ের খড়ম খুলে বৌয়ের মাথায় বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলেন। বৌ তাঁর সামান্যই নাগাল পেল। ব্যাপার দেখে দীর্ঘশুণ্ড আনন্দের চোটে নেচে কুঁদে হাততালি দিয়ে এক কাণ্ড করলেন। তাঁর বৌরাও তো তাঁকে যথেষ্ট জ্বালায়। কারো বৌ জব্দ হচ্ছে দেখলে তাঁর ফুর্তি হয়। দেখতে দেখতে খর্বুরের বৌকে হার মানতে হ'ল। খর্বুরের তখন গালভরা হাসি আর শিরার মধ্যে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ছুটতে লাগল। দীর্ঘশুণ্ড একটু চেটেও দেখলেন, অমন মিষ্টি রক্ত তিনি আর কোথাও পাননি।

মারামারি সাঙ্গ হলে, খর্বুরকে খেতুর দুর্দশার কথা বুঝিয়ে বলা হল। খর্বুর তাঁদের সাহস দিয়ে বললেন 'চলুন আমাকে সেখানে নিয়ে। নাকেশ্বরী টরিকে আমি ভয় পাই না। ডাকিনী ভূতিনী আমাকে দেখলেই পাঁই পাঁই পালায়।' তারপর খর্বুরকে নিয়ে ওঁরা সকলে প্রাসাদের দিকে চললেন। পাহাড়ের বাইরে পৌঁছে হাতির পিঠ থেকে তিনজনে নামলেন। হাতি বাইরে জঙ্গলের ধারে থেকে গেলেন। সুড়ঙ্গে ঢোকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি কচি কচি

ডালপালা ভেঙে খেয়ে আর থেকে থেকে গা দুলিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। বাকিরা সুড়ঙ্গের দিকে চললেন।

নাকেশ্বরী ভূতিনী হলেও লোক নিতান্ত স্বার্থপর ছিল না। কঙ্কাবতীকে ভাগিয়ে, খেতুকে পেয়ে বসে, হঠাৎ তার বুড়ি মাসির কথা মনে পড়ল। আহা বেচারির শক্তি গেছে, এখন আর ভালো মন্দটা জোগাড় করে খেতে পারে না। এই কচি তাজা মানুষটাকে যখন পাওয়া গেছে, তখন মাসি বেচারিকে নেমন্তন্ন করে আনলে বেশ হয়।

যেমন কথা তেমনি কাজ। খেতু অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় একা পড়ে রইল আর নাকেশ্বরী সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে, এক-ঠেঙোদের দেশ ছাড়িয়ে, মাসির বাড়ি থেকে মাসিকে নিয়ে আসতে অনেকটা সময় কেটে গেল। ফোকলা মাসি খেতুর নরম শরীর দেখে মহা খুশি। ঠিক সেই সময় হাতির পিঠ থেকে মশার সঙ্গে কঙ্কাবতী আর খর্বুর নেমে সুড়ঙ্গে ঢুকল।

সুড়ঙ্গের বাইরে হাতির ডাক; সুড়ঙ্গের ভিতরে মশার ভানার ভন্‌ভন্; খর্বুরের আর কঙ্কাবতীর গলার স্বর, সমস্তই নাকেশ্বরীর কানে গেল। সে অমনি লাফিয়ে উঠে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে! সব ব্যবস্থা বুঝি পণ্ড হল। মেয়েটা ওঝা এনেছে।' মাসি বলল, 'চল, চল, প্রাসাদের সিংদোরের দু-পাশে দু-ঠ্যাং রেখে দাঁড়াই।'

* * *



॥ ২১ ॥

মশা, কঙ্কাবতী আর খর্বুর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে, সিংদোর দিয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন। ভূতিনীদের ঠ্যাংএর তলা দিয়ে যাবার সময় কেউ কিছু লক্ষ্য করলেন না। ঘরে ঢুকে দেখলেন খেতুর অবস্থা কাহিল। অচেতন শরীর, নিশ্বাস পড়া বোঝা যাচ্ছে না, প্রাণ আছে কি না টের পাওয়া যাচ্ছে না। কঙ্কাবতী ছুটে গিয়ে খেতুর পা-ছুটি বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগল।

খর্বুর খেতুকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, 'কঙ্কাবতী তুমি কেঁদো না। রুগী এখনো বেঁচেই আছে। শীগ্‌গিরি তাকে আমি সুস্থ করে তুলব।' এই বলে কত মন্ত্র পড়লেন, কত ওষুধ করলেন, সর্বাঙ্গে কত ফুঁ দিলেন; তবু খেতু নড়ল না। তাই দেখে খর্বুর অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি করে হল? আমার তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁক ওষুধপত্র কোনো কাজ করছে না কেন? চলুন তো একবার বাইরে গিয়ে দেখি, কেউ গুণ্ করছে কি না।'

তিনজনেই একেবারে সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে এসে, ফিরবার সময় সিংদোরের উপরে ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়ানো ভূতিনী দুটোর উপর খর্বুরের চোখ পড়ল। তিনি মনে মনে হাসলেন। এ চালাকির ওষুধ তাঁর ছিল। এবার বাইরে থেকে মন্ত্র পড়তেই ভূতিনীরা ঠ্যাং তুলে নিয়ে পালাল। খর্বুর নাকেশ্বরীকে খেতুর শরীরে ডেকে আনলেন। খেতুর মুখ দিয়ে তাকে কথা

বলালেন। কড়া কড়া ওষুধ দিয়ে আর মন্ত্র পড়ে, নাকেশ্বরীকে হুকুম করলেন 'এক্ষুণি খেতুকে ছেড়ে যাও।'

নাকেশ্বরী বড়ই ঢ্যাটা। খেতুর মুখ দিয়ে সে বলল, 'এই লোকটি আমার কাছে গচ্ছিত ধন সরিয়েছে। একে ছেড়ে যাওয়া আমার কর্তব্য নয়।' আরো কড়া কড়া ওষুধের ফলে নাকেশ্বরী ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তবু যাই-যাই বলেও কিছুতেই আর খেতুকে ছেড়ে যায় না!

তখন খর্বুর একটি মোক্ষম উপায় করলেন। একটা কুমড়ো এনে তাতে সিঁদুর লাগিয়ে, মন্ত্র পড়ে বললেন, 'এক্ষুণি এটাকে বলি দেব। দেখি তুমি কি করতে পার!' এই বলে খাঁড়া তুললেন। নাকেশ্বরী কাতর হয়ে বলল, 'ও কাজও করবেন না, আমিও তাহলে দু-টুকরো হয়ে যাব।'

খর্বুর বললেন, 'তাহলে যাচ্ছ না কেন?'

নাকেশ্বরী ব্যাকুল হয়ে বলল, 'আমি গেলেও ও যে বাঁচবে না। ওর মোটে আয়ু নেই। ওর পরমায়ুটাকে পাতায় জড়িয়ে তালগাছে তুলে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম মাসিতে আমাতে খাওয়াদাওয়ার পর ঐ নিয়ে মুখশুদ্ধি করব। তা দুঃখের কথা আর কি বলব, খুদে পিঁপড়েতে চেটেপুটে পরমায়ুটাকে খেয়ে ফেলেছে। সে আর ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। তাই বলছি আমি ছেড়ে গেলেই ছেলেটা মরে যাবে।'

খর্বুর গুণে গেঁথে দেখলেন সে সত্যি কথাই বলেছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'সেই পিঁপড়েগুলোকে ধরে নিয়ে এসো।' কি আর করে নাকেশ্বরী, আঁতিপাঁতি খুদে পিঁপড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। গাছের ফোকরে, মাটির গর্তে, কাঠের খাঁজে, পাথরের

ফাটলে। কত পিঁপড়ের দেখা পেল, ডেঁও পিঁপড়ে, কাঠ পিঁপড়ে, শুড়শুড়ি পিঁপড়ে, টোপ ফেলার বড় পিঁপড়ে। সবাইকে দেখল, খালি খুদে পিঁপড়েদের চিহ্নটি পেল না। শেষটা একটা কানা পিঁপড়ে বড় সাংঘাতিক কথা বলল। খুদে পিঁপড়েরা পরমায়ু খেয়ে, নদীতে আঁচিয়ে, বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। হেনকালে কোট প্যাণ্টেলুন পরা একটা ব্যাঙ এসে কুপ-কুপ করে সব কটাকে খেয়ে ফেলেছে। এ নাকি তার নিজের চোখে দেখা।

নাকেশ্বরীর মুখে এই মর্মান্তিক কথা শুনে খর্বুর তাকে ব্যাঙটাকে খুঁজে আনতে পাঠালেন। না বলবার সাহস ছিল না নাকেশ্বরীর। কিন্তু সব সম্ভব-অসম্ভব জায়গা খুঁজেও তাকে না পেয়ে, খর্বুরের কাছে সে কেঁদে পড়ল, 'আমাকেই মারুন আর কুমড়োই কাটুন, সত্যিই তার সন্ধান পেলাম না।'

তখন খর্বুর সরষে-চালা মন্তর করলেন। এক মুঠো সরষের উপর মন্ত্র পড়ে দিলেন ছুঁড়ে। সরষেগুলো ভীষণ বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে এসে, শেষটা এঁদো পুকুরের ধারে, একটা বড় আরামের ঠাণ্ডা গর্তে পৌঁছে, ব্যাঙটার মাথায় কাঁটার মতো ফুটে গেল। টুপি খসে পড়ল। ছাল-চামড়া ফুটো করে, সরষে গিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকল। ব্যথার চোটে ব্যাঙ গাঁক গাঁক ডাক ছাড়লেন। সরষেগুলো তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকিয়ে, একেবারে প্রাসাদের সিংদোরে পৌঁছে দিল। ব্যাঙ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। মশা দরজা খুলে দিলেন। ব্যাঙ গিয়ে খেতুর পাশে দাঁড়ালেন। সেখানে খর্বুর আর কঙ্কাবতী ছিল। ব্যাঙ সায়েবকে দেখেই কঙ্কাবতী চিনতে পারল ; ব্যাঙও তাকে চিনলেন।

দুঃখিত ভাবে বললেন, 'ওগো সুন্দর মেয়ে, আধুলীর কথা শেষটা

ঐ বেঁটেকে বলে দিলে? তাই সে সরষে চালা করে আমাকে ধরে আনল! আমি আর কিছু চাই না। আধুলীর যেটুকু আমার পাওনা আছে, তার উপর আমার দাবি আমি তুলে নিচ্ছি। তোমরা ভাগ করে নিও। এখন ও বেঁটে মশাই, সরষেগুলোকে ডেকে নিন্, নইলে আমার প্রাণ যায়।'

তখন খবুর তাঁকে ডেকে আনার আসল কারণটি বুঝিয়ে শেষে বললেন, 'এবার ঐ পিঁপড়েগুলোকে যদি বমি করে দাও, তাহলে আমরা আর কিছু চাই না। সব কথা শুনে ব্যাঙও পিঁপড়ে বের করে দিতে রাজি হলেন। গলায় আঙুল দিয়ে অনেক চেষ্টাও করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

* * *



॥ ২২ ॥

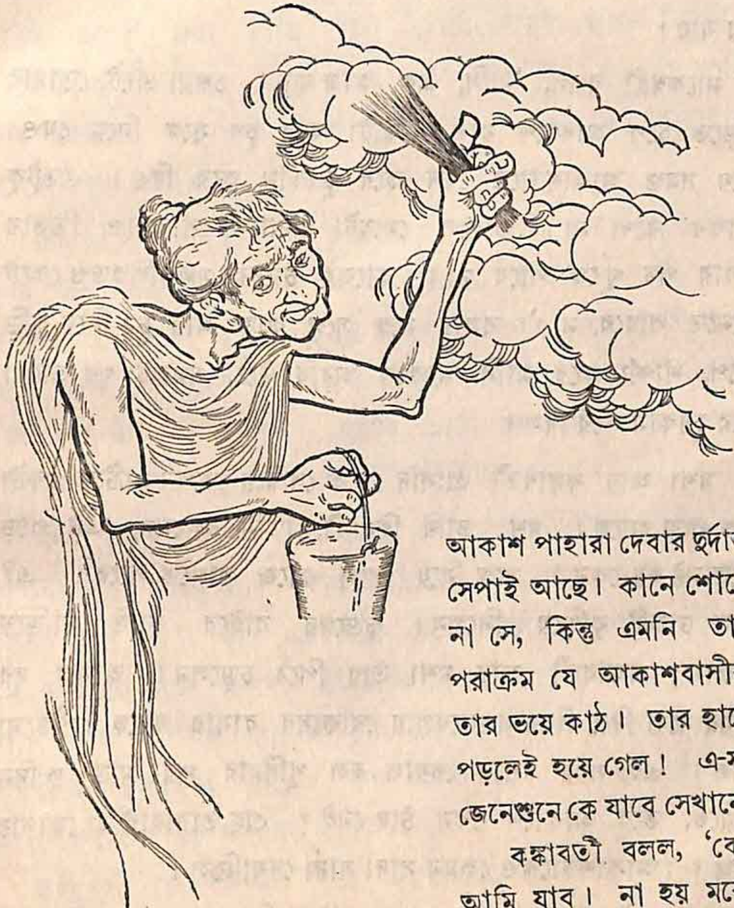
খর্বুর তখন মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। এ কি বিটকেল ব্যাঙরে বাবা! কিছুতেই বমি করবে না! তাঁর জানা যত রকম অব্যর্থ ওষুধ ছিল, সব চেষ্টা করা হল। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না। তখন মরিয়া হয়ে খর্বুর আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবলেন, 'এবার তোমাকে বাগে পেয়েছি, বাপু! এক্ষুণি মজাটা টের পাবে। হাসিমুখ বের করছি!' মশাকে বললেন, 'এ ব্যাঙকে বমি করাবার একটি মাত্র ওষুধ আছে। সে আবার পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। চাঁদে গিয়ে, চাঁদের মূল শিকড়ের এক তোলা ছাল এনে, তার সঙ্গে সাতটা গোলমরিচ বেটে খেলেই ব্যাঙের বমি হতে বাধ্য! আর কিছুতে হবে না।'

এ-কথা শুনে মশা আর কঙ্কাবতী হতাশ হল। কঙ্কাবতী সকলকে বলতে লাগল, 'আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। আমার কপাল দোষে কোনো ফল হল না। আপনারা বাড়ি যান। আমি আমার স্বামীর পা দুখানি কোলে করে মরতে চাই। আর আমার কোনো সাধ নেই।'

এ-কথা শুনে সকলেরি ভয়ানক কষ্ট হল। মশা বললেন, 'চাঁদ অবধি উড়ে যাবার আমার সাধ আছে, সাধ্য নেই। রক্তবতী-মাকে কি বলে বোঝাব?' খর্বুর কিন্তু আশা দিলেন। বললেন, 'শক্ত হলেও কাজটা একেবারে অসম্ভব নয়। একটা খোক্কসের বাচ্চা পেলেই কাজটা সহজ হয়ে যায়। তার পিঠে চড়ে যে কেউ

চাঁদে চলে যেতে পারে। কিন্তু ধাড়ি খোক্কসরা যেমনি অবাধ্য, তেমনি বদমেজাজী।'

ব্যাঙ বললেন, 'আমি খোক্কসের বাচ্চার সন্ধান জানি। না হয় পাকে প্রকারে তাকে ধরাও গেল। কিন্তু তার পিঠে চেপে আকাশে উড়বে কে? যে যাবে, তাকে প্রাণ হাতে করে যেতে হবে।



আকাশ পাহারা দেবার দুর্দান্ত সেপাই আছে। কানে শোনে না সে, কিন্তু এমনি তার পরাক্রম যে আকাশবাসীরা তার ভয়ে কাঠ। তার হাতে পড়লেই হয়ে গেল! এ-সব জেনেশুনে কে যাবে সেখানে?

কঙ্কাবতী বলল, 'কেন, আমি যাব। না হয় মরেই যাব। এমনিতেই আমার স্বামী না বাঁচলে আমার বাঁচার ইচ্ছা নেই। একটা খোক্কসের বাচ্চা পেলেই হল।'

তখন ঠিক হল ব্যাঙ পথ বাৎলে দিলেই, হাতির পিঠে চড়ে মশা আর কঙ্কাবতী খোক্কসের বাচ্চা ধরতে যাবে। ব্যাঙ আর খর্বুর খেতুকে পাহারা দেবেন। এই সব পরামর্শ খোলাখুলি ভাবেই হয়েছিল। কাজেই নাকেশ্বরী আর তার মাসিও সব শুনেছিল। দুজনার কি আপশোস! এমন ভালো খাওয়াটি বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়!

নাকেশ্বরী বলল, 'মাসি, এক কাজ কর। চশমা এঁটে, তোমার ঝুড়িতে চেপে আকাশে যাও। ঝাঁটা আর চুণ সঙ্গে নিয়ে যেও। গিয়ে সমস্ত আকাশটাতে বেশ করে চূণকাম করে দিও। এতটুকু ফোকর রেখো না। তাহলে মেয়েটা সেখানে পৌঁছলেও, ভিতরে যাবার পথ খুঁজে পাবে না। কাজেই চাঁদের মূল শিকড়ও কেটে আনতে পারবে না।' বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ু আর চূন নিয়ে ঝুড়ি চেপে, শাঁ-শাঁ করে মাসি আকাশ অবধি উঠে, সমস্তটা খুব ভালো করে চূণকাম করে দিল।

মশা আর কঙ্কাবতী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে দেখেন মাটিতে একটা ঢাক পড়ে আছে। মশা ভারি হিসাবী, তিনি বললেন, 'এটা পড়ে পড়ে নষ্ট হয় কেন? সঙ্গে নিয়ে গেলে কাজে লাগতে পারে।' এই বলে ঢাকটি কুড়িয়ে নিলেন। সুড়ঙ্গের বাইরে হাতি দাঁড়িয়ে ছিলেন; কঙ্কাবতী আর মশা তাঁর পিঠে চড়লেন। অনেক দূর বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় খোক্কসের বাসার কাছে পৌঁছনো গেল। এই সময় মশার খেয়াল হল পূর্ণিমার পর মাত্র দু-দিন হয়েছে, তবে আকাশে কেন চাঁদ নেই? গ্রহ তারারাই বা কোথায় গেল? আকাশটাকেও কেমন সাদা সাদা দেখাচ্ছিল।

খোক্কসনী বাসায় বসে বাচ্চা আগলাচ্ছিল। কঙ্কাবতীর গন্ধ

পেয়ে, সে বিকট হাঁক দিল, 'হাঁউমাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। কে রে তোরা?' মশাও তেমনি ডাক দিলেন, 'তুই কে?' 'আমি খোক্কসনী!' 'আমরা ঘোক্কস!' 'সে আবার কি রে, বাবা? একটু কাশ্‌ তো শুনি।' মশা ঢং ঢং করে ঢাক পেটালেন। খোক্কসনী আঁৎকে উঠল। তবু সাহস করে বলল, 'দেখি তোদের মাথার এক গাছি চুল?' মশা হাতি বাঁধা মোটা দড়িটা ছুঁড়ে দিলেন। খোক্কসনীর কি ভয়! বাবা! এই রকম যার চুল, সে না জানি কত ভয়ঙ্কর। তবু সাহসে ভর করে বলল, 'আচ্ছা, তোদের মাথার একটা উকুন দেখি।'

এবার মশা ভারি বুদ্ধি করলেন। কঙ্কাবতী আর তিনি হাতির পিঠ থেকে নামলেন। মশা বললেন, 'ভায়া, এইবার?' এই বলে হাতিকে খোক্কসের বাসায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। গর্তে পড়েই শুঁড় দিয়ে হাতি খোক্কসের ছানাটাকে জড়িয়ে ধরে তুলে আনলেন। সেটা তো চিল চ্যাঁচাতে লাগল। ভয়ের চোটে খোক্কসনী বাসা ফেলে পালাল। তাই দেখে মশা আর কঙ্কাবতী কাছে এলেন।

মশা বললেন, 'দেখ কঙ্কাবতী, এই ছোট বাচ্চাটা তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না। বোঝাই যাচ্ছে এ নেহাৎ ছোট, এখনো মায়ের দুধ খায়। তুমি এর পিঠে চেপে স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে, চাঁদের কাছে যেতে পারবে। চাঁদটাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না বুঝলাম না। তবে আকাশে গেলেই তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। কাজ হলেই চলে আসবে। আমরা এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

কঙ্কাবতী খোক্কসছানার পিঠে চড়বামাত্র, সে শাঁই শাঁই করে আকাশে উড়ল আর দেখতে দেখতে পৌঁছেও গেল। কিন্তু তার

পরেই অসুবিধা হল। কঙ্কাবতী চেয়ে দেখল সমস্ত আকাশ কে চূণকাম করে লেপে পুঁছে রেখেছে। চাঁদ তারা গ্রহ কিছুই ঠাওর



হচ্ছে না। ভিতরে যে ঢুকবে, তার একটা ফাঁক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কি আর করে, কোথাও যদি এতটুকু চিড় খেয়ে থাকে, সেখান দিয়ে গলে যাবে, এই মনে করে আকাশময় ঘুরতে লাগল সে।

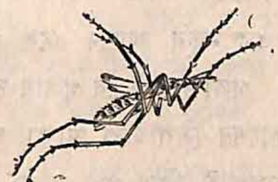
হঠাৎ দেখে ছোট্ট একটা ছ্যাঁদা দিয়ে নক্ষত্রদের এক বৌ উঁকি মেরে দেখছে। ওকে দেখেই লজ্জায় সে সরে গেল, কিন্তু আবার উঁকি মারল। কঙ্কাবতী তাকে মিষ্টি ভাষায়

ডাকল। বৌটি বলল, 'তুমি কে ভাই? অনেকক্ষণ ধরে কি খুঁজছ, ভাবলাম একবার জিজ্ঞাসা করি। বৌমানুষ বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলি না।'

কঙ্কাবতী বলল, 'আমি বড় দুঃখিনী। একবার ভিতরে ঢুকতে পারলে, আমার স্বামীর ওষুধের ব্যবস্থা করি।' বৌ বলল, 'একটা ভূতিনী এসে চূণকাম করে সব লেপে পুঁছে দিয়ে গেছে। আমি খিড়কি দোর খুলে দিচ্ছি, তুমি সেই পথে এসো।'

এই বলে সে খিড়কিদোর খুলে দিল। কঙ্কাবতী ঢুকল।

* * *



॥ ২৩ ॥

আকাশের চারদিক মনে হ'ল শান্ত চুপচাপ। একটা মেঘের ডালে খোক্কসছানাটাকে বেঁধে, কঙ্কাবতী তাকিয়ে দেখল চারদিকে নানা রঙের তারা ফুটে আছে। তাদের গা থেকে আলো বেরোচ্ছে। বেশ খানিকটা দূরে একটা চাকার মতো চাঁদকেও দেখা গেল।

যেমন করেই হ'ক, কঙ্কাবতীর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ খবর পেলেন একটা মানুষ তাঁর মূল শিকড় কাটতে আসছে। ভয়ের চোটে তিনি তো কেঁপেই সারা। তাঁর মনে হল সুন্দর হওয়া বড় জ্বালা। রাহু তো গিলে খাবার জন্য নিয়ম মতো পিছনে লেগেই আছে। এ আবার এক নতুন আপদ এসে মূল শিকড় চায়। দেখ দিকিনি কি অন্যায়! গলাও নেই যে গলায় দড়ি দেবেন, ছাই!

শেষ পর্যন্ত আকাশের সিপাইকে ডাকা ছাড়া উপায় রইল না। এমনিতে লোকটা ভালোই কিন্তু বদ্ধ কালা। তাকে ডেকে চিৎকার করে চাঁদ বললেন, 'দেখ গিয়ে একটা মানুষ আমার মূল শিকড় কাটতে এসেছে।' সিপাই বলল, 'ঢের হয়েছে! অত বড় হাঁ করলে দু-টুকরো হয়ে যাবেন যে। সে যাই হক, যদি কোথাও ডাকাতি করতে যেতে হয়, আমাকে সমান ভাগ দিতে হবে, এই আমি বলে রাখলাম।'

চাঁদ বললেন, 'না, না, ডাকাতির কথা নয়। আমার মূল শিকড় কাটতে মানুষ এসেছে।' সিপাই বলল, 'বেশ তো, নিয়ে যাক না।

আমাকে ডাকা কেন?' চাঁদ চটে গেলেন, 'তুমি আকাশের সিপাই। আমাকে রক্ষা করবে না?'

সিপাই বলল, 'হ্যাঁ, তাই করতে গিয়ে, আমার মূল শিকড়টিও খোয়াই আর কি!' চাঁদ বললেন, 'কাজ করবে না তো মাইনে খাও কেন?'

সিপাই বলল, 'কি মাইনে দেখাচ্ছেন। এ কাজ ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীতে কনস্টেবল হব। সেখানে কেউ শিকড় কাটে না। মার-পিট হয় বটে, তবে সেখান থেকে দূরে থাকলেই হল। মার-পিট মিটে গেলে, দাঙ্গাবাজরা বাড়ি গেলে, দু-চারটে রাস্তার লোক ধরে নিয়ে হাজতে পুরব। এখন আমি চলি। গোলমালের মধ্যে আমি নেই।' এই বলে সে সত্যি সত্যি চলে গেল। চাঁদ গা ঢাকা দিলেন।

চারদিকে গুজব একটা লোক আকাশের সব বাসিন্দাদের মূল শিকড় কাটতে এসেছে। আর যাবে কোথায়! যে যেখানে পারে গিয়ে লুকোল। খালি বনে উপবনে ক্ষেতে ময়দানে যে যেখানে ফুটে ছিল তারারা সব মিট মিট করতে লাগল।

এদিকে কঙ্কাবতী আকাশের মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদের কাছে গিয়ে উপস্থিত। বেগতিক দেখে চাঁদ চোখ বুজে, নিশ্বাস বন্ধ করে, মরা সেজে থাকলেন। মরা চাঁদ দেখলে কেউ গামছায় বেঁধে নিয়ে যাবে না, এই ভরসায়।

কঙ্কাবতী চাঁদের কাছে পৌঁছে ভাবল, 'আহা, অমন সুন্দর চাঁদটি কি তবে মরে গেলেন!' ভালো করে দেখে বুঝল মরেন নি। হয়তো মুচ্ছো গেছেন। এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে; নিরিবিলিতে এক তোলা শিকড়ের ছাল চেঁচে নিতে পারবে। শিকড়টা তো

আর দু-টুকরো করার দরকার নেই। তাহলে হয়তো সত্যি মরে যাবেন। পৃথিবীর ডাক্তাররা রুগীকে অজ্ঞান করে অস্তর করেন; ইনি বেশ নিজের থেকে বেহুস হয়ে আছেন। এই ভেবে সে ছুরি দিয়ে আস্তে আস্তে মূল শিকড়ের ছাল চাঁচতে লাগল। তবু একটু লাগল। চাঁদ বললেন, 'উঃ! লাগে!'

কঙ্কাবতী বলল, 'এই যে হয়ে গেছে।' চাঁদ বললেন, 'ওটা আবার গজাবে তো?' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। একটু কাদা লাগিয়ে রেখো।' চাঁদ বললেন, 'যদি ঘা হয়?' 'তাতে কি হয়েছে। একটু লুচি ভাজার ঘি লাগালেই সেরে যাবে।'

চাঁদ সাহস পেয়ে বললেন, 'তুমি বুঝি মেয়ে ডাক্তার? তা আমার দাঁত বড় কন্ কন্ করে। কি করা যায় বল তো?'

কঙ্কাবতী বলল, 'পচা দাঁত ভালো হবার নয়। একটা কাজ কর। তোমার শিকড়ের ছাল পেয়েছি, তার সাহায্যে আমার রুগ্ন স্বামী সেরে উঠবেন। তিনি কলকাতায় থাকেন। তোমাকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। ডাক্তার তাঁর সাঁড়াশী দিয়ে সব পচা দাঁত তুলে দেবেন। তারপর নতুন দাঁত বাঁধিয়ে দেবেন।'

ব্যাপার শুনে মুখ গম্ভীর করে চাঁদ বললেন, 'না, না, ও সবের দরকার নেই। আমার দাঁত ব্যথা সেরে গেছে। তাছাড়া আমার মূল শিকড়ে ব্যথা করে দিয়েছ, অদ্দূর গড়াতে পারব না।'

কঙ্কাবতী বলল, 'বেড়াবে কেন? আমি তোমাকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাব।' শুনে ভয়ে চাঁদের প্রাণ উড়ে গেল। তিনি বললেন, 'না, না। আমি বড্ড ভারি। তুমি বরং বাড়ি যাও। বাড়ির লোকে ভাবছে!' এই সময় ছেলেপুলে নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে চাঁদনী এসে হাজির। 'ওগো তোমার শিকড় কাটলে তুমি মরে যাবে! তখন আমার কি হবে গো!'

চাঁদের ছেলে-মেয়েগুলো বড়ই বেয়াড়া। বিশেষ করে ছোট মেয়েটা। চাঁদ নিজে বলেছিলেন সেটি ছোট্ট গোল কালো পাথুরে পোকার টিপের মতো। সে মাঝে মাঝে কাঁদে; মাঝে মাঝে রাগ দেখায়; গাল দেয়; আঁচড়ে কামড়ে কঙ্কাবতীর গায়ে কালসিটে পড়িয়ে দেয়। তার নামে মায়ের কাছে নালিশ করতে উল্টো ফল হল। চাঁদনী বললেন, 'কেন মেয়ে সামলাব? তুমি আমাদের সর্বনাশ করবে আর আমরা কিচ্ছু বলব না?' কঙ্কাবতী বলল, 'চাদের দাঁতের চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, তা সে আর নিয়ে গিয়ে দরকার নেই। তোমাদের কোনো ভয় নেই।'

এ-কথা শুনে চাঁদনীর ভয় গেল বটে, তবু তিনি বলতে লাগলেন, 'তুমি বাছা বাড়ি যাও। ঢের তো হল।'

* * *



॥ ২৪ ॥

বাড়ি যেতে কঙ্কাবতীও চায়। ওষুধ পেয়ে তার মনে বড় আশা, স্বামী এবার সেরে উঠবেন। সে এখন সাধ আহ্লাদের কথাও ভাবতে পারছিল। আকাশ জুড়ে সব জায়গায় লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে আছে। একরাশি তারা কুড়িয়ে পুঁটলি বেঁধে তার বড়ই নিয়ে যাবার ইচ্ছা। তা অত বড় পুঁটলি বইবার একটা লোক তো চাই। মূল শিকড় কাটা যাবার ভয়ে বাসিন্দারা লুকিয়ে পড়েছে, পথঘাট শুন-শান্। লোক কোথায় পাবে ?

হঠাৎ দেখে মেঘের পিছন থেকে একটা লোক উঁকি মারছে। কিন্তু তাকে ডাকতেই সে ছুট দিল। কঙ্কাবতীও তার পিছন পিছন দৌড়ল। লোকটা বাতাসের মুখে খড়ের কুটোর মতো ছুটতে পারে। কিছুতেই ধরতে পারত না, যদি না একটা মেঘের ঢিপিতে হোঁচট খেয়ে সে আছাড় খেত। আছাড় খেয়ে আর উঠতে পারে না !

কঙ্কাবতীর বড় দয়া। সে অমনি ছুটে গিয়ে তাকে তুলে ধরল। দেখে তার পালকের মতো হাল্কা শরীর, তুই আঙুলে তোলা যায়। মনে হল হাড় মাস কিছুই নেই। ভালো করে পরখ করে বুঝল তু-তিনটে তালপাতা এক সঙ্গে সেলাই করে তার গা মাথা হাত পা তৈরি। তার উপর জামা পাজামা পরা। কঙ্কাবতী দেখে অবাক মানল।

তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে ?'

লোকটা বলল, 'আমি আকাশের তুর্দান্ত সিপাই। উঁহু! আঙুল

দিয়ে অমন করে আমাকে চিপ্‌কিও না। ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাই।'

কঙ্কাবতী বলল, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু শরীরটা তালপাতা দিয়ে তৈরি কেন?' পল্‌কা লোকটা চটে গেল, 'তালপাতার হবে না তো কি ইটকাঠ দিয়ে গড়া হবে? ধাড়ি হলে, আকাশ পর্যন্ত ধাওয়া করলে



আর তালপাতার সিপাইয়ের নাম শোননি? আমাকে ছেড়ে দাও।'

কঙ্কাবতী বলল, 'তা ছেড়ে দেব নিশ্চয়। তার আগে আমার একটা পুঁটলি কিছু দূরে পৌঁছে দিতে হবে।' কি আর করে, সে রাজি হয়ে গেল। আকাশ-

বুড়ির কাছ থেকে গামছা চেয়ে এনে, তাতে করে তারার পুঁটলি বাঁধা হল। আঁচলে করে আর কটা নেওয়া যায়?

খোক্কসের বাচ্চার কাছে পৌঁছে কঙ্কাবতী তালপাতার সিপাইকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে এমনি দৌড় লাগাল যে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কঙ্কাবতীও আর দেরি না করে খোক্কসের ছানার পিঠে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। সময় কাটাবার জন্য সে তিনটি তারার মালাও গেঁথে ফেলল। একটি খেতুর, একটি পচা-জলের আর একটি নিজের। মনে তার কত আশা।

দেখতে দেখতে খোক্কসের ছানা বাসার কাছে নামল। মশা আর হাতি সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। বাচ্চাটাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে, ওঁরা হাতি চড়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। ওষুধ পেয়ে খুশি হয়ে খর্বুর এক তোলা ছালের সঙ্গে সাতটি গোলমরিচ নিয়ে একটা পরিষ্কার শীলে সাবধানে বেটে, ব্যাঙ সায়েবকে খাইয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুড় হুড় করে, ব্যাঙাচি অবস্থা থেকে ব্যাঙ যা কিছু খেয়েছিলেন, সব বমি হয়ে গেল। পিঁপড়েগুলো তো ছিলই।

খর্বুর সাবধানে তাদের আলাদা করে বেছে নিয়ে, সরু সন্না দিয়ে প্রত্যেকের পেট থেকে এক কণা পরমায়ু বের করে একটা বাটিতে জমা করে বললেন, 'এ কি হল! এত বড় মানুষটার এতটুকু পরমায়ু হবে কেন? এতে কতটুকুই বা কাজ হবে?' এ কথায় সকলেরি মন খারাপ হয়ে গেল, খালি নাকেশ্বরীর আর তার মাসির মুখে হাসি আর ধরে না। ব্যাঙ প্রকাশ্যেই চোখের জল ফেলতে লাগলেন, মশার মুখ হতাশায় ভরে গেল, খর্বুর বিমর্ষ হলেন। কঙ্কাবতীর মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই।

যাই হক, যেটুকু পরমায়ু পাওয়া গেছিল, সেটি খেতুর নাকের

সামনে ধরতেই, সে নড়ে চড়ে উঠে বসল। তারপর কঙ্কাবতীর দিকে চেয়ে বলল, 'সে কি! এত বেলা হয়ে গেছে, আমাকে ডাকনি কেন? আর এঁরা সকলে কে?'

কঙ্কাবতীর চোখের জল আর বাধা মানে না। খেতু বলল, 'এবার সব মনে পড়েছে। আমার মাথায় শিকড় ছিল না, তাই আমাকে নাকেশ্বরী পেয়ে বসেছিল। কঙ্কাবতী, তুমি বুঝি এঁদের এনে আমাকে আবার সারিয়ে তুলেছ? তবে আর কান্না কিসের? আমি তো ভালো বোধ করছি। খালি একটু একটু মাথা ব্যথা করছে। আমি একটু শুই।'

দেখতে দেখতে খেতুর মাথার বেদনা অসহ্য রকম হয়ে উঠল। সে বুঝল তার প্রাণ যায়। সকলকে ডেকে বলল, 'তোমরা আমার কঙ্কাবতীকে দেখো। ওকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে এসো।' তারপর ভগবানের নাম নিয়ে খেতু ঢলে পড়ল। সকলে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। খালি কঙ্কাবতী স্থির হয়ে রইল। ক্রমে তার শরীর অবশ হয়ে এল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

* * *



॥ ২৫ ॥

কঙ্কাবতীর সেই যে জ্বর বিকার হয়েছিল, তারপর বাইশ দিন কেটে গেল। মেয়ের জ্ঞানগম্যি নেই, মায়ের বিশ্রাম নেই। সারাক্ষণ মেয়ে ভুল বকে। সব সময় বদ্যিমশাই কাছে কাছে থাকেন। সে দিন তিনি প্রসন্ন মুখে কঙ্কাবতীর মা-কে বললেন, 'এখন মেয়ে যে ঘুমোচ্ছে, এ ঘুমটি স্বাভাবিক, এতে জ্বরের আচ্ছন্নতা নেই। এই সময় বড় সাবধানে থাকতে হবে। বাড়িতে যেন টুঁ শব্দটি না হয়।' এই বলে তখনকার মতো বদ্যি চলে গেলেন। বাড়ির সকলে পা টিপে টিপে হাঁটে, ফিস্‌ফিস্ করে কথা কয়। মা চুপ করে মাথার কাছে বসে। থেকে থেকে নাকের কাছে হাত রেখে দেখছেন নিশ্বাস পড়ছে কি না।

এই বাইশ দিন মায়ের যে কি ভাবে কেটেছে তা চিন্তা করা যায় না। নাওয়া-খাওয়া নেই, ঘুম নেই। অষ্ট প্রহর সজাগ হয়ে পাশে বসে আছেন। জ্বরের ঘোরে মেয়ে উঠে বসলে, তাকে শুইয়ে দেন। ভুল বকলে, তাকে শান্ত করেন। মেয়েরাও কাছে কাছে আছে।

কঙ্কাবতীর রোগের সঙ্গে লড়াই করে, শরীরে আর কিছু বাকি নেই। দেখলে চেনা যায় না। এত দিন পরে বোধ হয় সকলের দুর্ভাবনা কমল। অনেকক্ষণ ঘুমোল কঙ্কাবতী। রাতটা কেটে গেল, সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। মা আর দিদি পাশে চুপ করে ঠায় বসে। কঙ্কাবতীর ঠোঁট একবার নড়ল; কি যেন বিড়বিড়

করে বলল, বোঝা গেল না। একটু পরে আবার কি বলল। মা বললেন, 'মুখে খেতুর নাম ছাড়া কথা নেই। ভালোয় ভালোয় বিয়ে হয়ে গেলে, তবে আমি শান্তি পাই।'

মা-র গলাটি বড় মিষ্টি। সে স্বর কানে যেতেই কঙ্কাবতী চোখ খুলে, অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখল। বড়দিদি বললেন, 'কঙ্কাবতী, বলতো আমি কে?' কঙ্কাবতী বলল, 'দিদি'। মা-কে দেখিয়ে দিদি বললেন, 'ইনি কে?' 'মা।'

এই সময় তনু রায় ঘরে ঢুকে সস্নেহে বললেন, 'কেমন আছ, মা?' 'ভালো আছি, বাবা।' বাবা এসে কাছে বসে, গায় মাথায় হাত বুলিয়ে, আবার চলে গেলেন। কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করল, 'মা, আমার কি খুব অসুখ করেছিল?' 'হ্যাঁ, মা, বাইশ দিন যমে মানুষে টানাটানি। ভগবানের দয়ায় ভালো হয়ে উঠছ।'

কঙ্কাবতী বলল, 'মা, সারাক্ষণ ধরে খালি স্বপ্ন দেখেছি। এত স্পষ্ট স্বপ্ন যে কোনটা সত্যি, কোনটা স্বপ্ন, সব আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, মা, জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রী কি সত্যি মারা গেছেন?' 'হ্যাঁ, মা, সত্যি গেছেন।'

কঙ্কাবতী বলল, 'বরফ খাওয়া নিয়ে সত্যি দলাদলি হয়েছিল?' 'হ্যাঁ রে মা, খেতুর মা-কে কি কম দুঃখ দিয়েছে এরা।' 'তিনি কোথায়?' 'এখানেই আছেন। প্রায় সারা দিন এখানে থাকেন। তোমাকে বড্ড ভালোবাসেন। খেতুর সঙ্গে তোমার বিয়েতে তোমার বাবার মত হয়েছে। তুমি সেরে উঠলেই হবে।'

কঙ্কাবতী বলল, 'আমি কি জ্বরের ঘোরে ঘাটে গিয়ে, জেলেদের নৌকো চড়েছিলাম?' 'বালাই, ষাট! তা করবে কেন? সেই ইস্তক জ্বর হয়ে তুমি এখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ। কোথাও যাও নি।'

কঙ্কাবতী বলল, 'মা, কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি সে আর কি বলব!' মা-কে স্বপ্নের কথা সব বলল কঙ্কাবতী। তারপর গ্রামের সমস্ত খবর ক্রমে ক্রমে বললেন মা। বরফ খাওয়া নিয়ে দলাদলি মিটে গেছে। জনার্দন চৌধুরীর বড় আদরের এক নাতি হঠাৎ মারা গেল। জনার্দনের খোশামুদে পরামর্শদাতা গোবর্ধন শিরোমণিরো গুরুতর অসুখ হয়েছিল। এদিকে কঙ্কাবতীর তো ঐ অবস্থা।

এই সমস্ত দেখে জনার্দন চৌধুরীর মনের একটা বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। রামহরিকে তিনি গ্রামে ডেকে এনেছেন। রামহরি তাঁর কথায় নিরঞ্জনকে নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে এক দিন এদের দুজনের সঙ্গে তনু রায় আর খেতু জনার্দনের বাড়ি গেছিলেন। জনার্দন তাঁদের বলেছেন, 'বুড়ো বয়সে আমার মাথা খারাপ হয়েছিল, তাই আবার বিয়ে করার কথা ভাবছিলাম। কত অন্যায় কাজ করেছি। নিরঞ্জনকে দেশত্যাগী করেছি; ছেলেমানুষ খেতুর উপর কত অত্যাচার করেছি। তোমরা সকলে আমাকে ক্ষমা কর।'

এখন নিরঞ্জন আবার গ্রামে বাস করছে, জনার্দন তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; কঙ্কাবতীর গুরুতর অসুখ দেখে তনু রায়ের আর তাঁর ছেলের অন্য রকম স্বভাব হয়েছে। তনু রায়ের মধ্যে দয়া মায়া স্নেহ দেখা যাচ্ছে। ছেলে সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। এবার কঙ্কাবতী সেরে উঠলেই বিয়ের বাদ্যি বাজবে।

সেরে উঠতে অনেক দিন সময় লেগেছিল। দুর্বলতা যেতে আরো কিছু দিন। রামহরির মেয়ে সীতা সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। অবাক্ হয়ে তার স্বপ্নের কথা শুনত। তামাসা করে বলত, 'এ্যাঁ, আকাশ থেকে তারাগুলো এনে তোমার পচাজলকে

দিলে, আমার জন্য একটাও রাখলে না ?' যখন কঙ্কাবতী সম্পূর্ণ সুস্থ হল, সে সকলের সামনে একটু আধটু বেরোত। একদিন খেতু একটা মশা ধরে এনে, মজা করে বলল, 'দেখতো এ তোমার পচাজল কি না ?'

তারপর একটা শুভদিনে কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেতুর বিয়ে হয়ে গেল। অনেক দুঃখের পর এই আনন্দের ব্যাপারে সকলের মনে কত সুখ হয়েছিল সে সহজেই কল্পনা করা যায়। বিশেষ করে জনার্দন চৌধুরীর আনন্দ দেখবার মতো ছিল। সারাদিন তিনি তনু রায়ের বাড়িতে অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে কলকাতা থেকে অনেক বরফ আনিয়ে সবাইকে খাইয়ে সকলকে বলেছিলেন, 'বর একলা বরথ খাবে, সেটি হচ্ছে না। আমরা সকলেও আজ বরথ খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করব।'

পাড়াগাঁয়ের লোকরা এই প্রথম বরফ খেয়ে মহা খুশি। গদাধর ঘোষ তো তিন ঘটি বরফ জল খেয়েছিল বলে শোনা যায়। কড়মড় করে চিবিয়েই প্রায় সেরটাক সাবাড় করেছিল।

এইভাবে আনন্দের মধ্যে দিয়ে কঙ্কাবতীর আর খেতুর দুঃখের দিন শেষ হয়েছিল।

—ঃ শেষ ঃ—

